দময়ন্তী

বুদ্ধদেব বসু

প্রণীত

কবিতার বই

বন্দীর বন্দনা

পৃথিবীর পথে

কঙ্কাবতী

নতুন পাতা

এক পয়সায় একটি

২২শে শ্রাবণ

বিদেশিনী

দময়ন্তী

দময়ন্তী

বুদ্ধদেব বসু

কবিতা  ভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা

প্রথম বার
জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০
মে ১৯৪৩

দাম আড়াই টাকা

কবিতা ভবন ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ থেকে বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক প্রকাশিত
ও ওয়েলিংটন স্কোয়ার মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস থেকে
ব্রজেন্দ্রকিশোর সেন কর্তৃক মুদ্রিত।

দময়ন্তী

বিচিত্রিত মুহূর্ত

প্রচ্ছদশিল্পী : [illegible]

দময়ন্তী

সমর সেন

স্মরণীয়েষু

দর্শন দুর্গম অতি, রাজনীতি কর্কশ জটিল,
ক্লান্ত প্রাণ ঘুরে মরে বিতর্কের গোলকধাঁধায়,
মীমাংসার স্বর্ণমৃগ সন্ধানীরে নিত্যই কাঁদায়,
প্রতি পক্ষে পিত্ত জ্বলে, সত্তার কপাটে পড়ে খিল।
আমাকে ফিরায়ে নাও অজ্ঞতার মত্ততায়, নীল,
নীল স্তব্ধতার অন্ধকারে, যেখানে বিশ্বের দায়
জ্বালায় ধ্যানের শিখা।—দাও সেই বুদ্ধিরে বিদায়
কৈলাসেরে লক্ষ্য ক'রে যে-দাম্ভিক ছোঁড়ে শুধু ঢিল।

বিতর্ক-বিরক্ত মন দ্বিখণ্ডিত দর্পণের মতো
বিড়ম্বিত প্রতিবিম্বে রাষ্ট্র করে বিশ্বের বিকৃতি,
পরস্পরে হত্যা করে প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তির সেনানী।
আমার আকাঙ্ক্ষা তাই কবিত্বের অদ্বিতীয়-ব্রত,
সংঘহীন সংজ্ঞাতীত এককের আদিম জ্যামিতি—
স্তব্ধতার নীলিমায় আত্মজাত পূর্ণতার বাণী।

দময়ন্তী

বিনয় বৃদ্ধের বিদ্যা। দাম্ভিক যৌবন
মনে করে সূর্য তারই সম্ভোগের পথের প্রদীপ,
তারার সেনানী তারই রতি-হ্রস্ব রাত্রির পাহারা।
উদ্ধত সে,
সামান্য সংকল্প তার নষ্ট হ'লে অদৃষ্টের দোষে
বিশ্বে নিন্দে, আপনারে অক্ষম ধিক্কারে
ক্ষত করে :
'আমি হৃতস্বার্থ, তাই সূর্য কেন্দ্রচ্যুত।'

সহস্র বসন্ত ছিলো আমার যৌবন।
সহস্র চৈত্রের রাত্রি চৈত্ররথ-বনে
কাটায়েছি। সেই রাত্রি, পুঞ্জ-পুঞ্জ বসন্তের মন্থিত অমৃত
যেদিন শরীরে তোর মুঞ্জরিবে, রে কন্যা আমার,
তোর পাণিপ্রার্থী হ'য়ে দেবত্রয় আসিবে সেদিন,
স্বয়ং মহেন্দ্র, অযোনিজ অগ্নি, কালান্তক যম।

স্বর্গ তোরে চায়, যজ্ঞ তোরে চায়, মৃত্যু তোরে চায়।
কিন্তু যৌবনের জাদু স্বর্গ রচে জন্তুর গুহায়,
নাভিমূলে যজ্ঞবেদী, মৃত্যু আরো নিচে।
একদিন হংসদূত এসে
তারি সঙ্গোপন মন্ত্র জ'পে গেছে তোর কানে-কানে,
শুনায়েছে প্রিয়তম নাম।
'প্রণাম, প্রণাম,
দেবগণ, ক্ষমা করো, ত্রাণ করো বিপন্নারে,
যেন চিনি তারে
সহস্র নলের মধ্যে, এই বর দাও।'

ফিরে যাবে দেবগণ। ওরে দেববিজয়িনী
যৌবনগর্বিণী কন্যা,
রে কন্যা আমার,
সেদিন মুখশ্রী তোর পূর্ণিমার মতো
আকর্ষিবে উচ্ছল অশ্রুর বেগ দু'জনের চোখে—
নয়, নয় বিচ্ছেদের শোকে,
আনন্দে, স্মৃতির স্রোতে, অতীতের উত্তরাধিকারে।

শোন্ তোরে বলি :
যে ত্রিবলী
তোর জন্ম-সিংহদ্বারে প্রহরীপ্রতিম
আজো তা লাবণ্যময়, করুণ, মধুর।
যে-বন্ধুর
শরীর লজ্জিত, আজো, আপনার আকর্ষণ জেনে,
একদিন তার স্বয়ম্বরে
স্বয়ং মহেন্দ্র, যম, বৈশ্বানরে
ক্ষুণ্ণ ক'রে যে-মর যৌবন
হয়েছিলো জয়ী,
তার দন্তে শ্বেত কেশ আজ ব্যঙ্গ করে,
কালাঙ্কিত কপোলে ললাটে
দেবতারই বিপরীত প্রতিপত্তি রটে।

তবু জৈব জাদু ব্যর্থ নয়।
যে-প্রণয়
বিবসন, বিশুদ্ধ, জান্তব
মৃত্যু নেই তার।
আছে শুধু রূপান্তর, আয়ুর সর্পিল সোপানে-সোপানে
আছে নবজীবনের অঙ্গীকার।
যে-মুহূর্তে বাসনাবিহ্বল নীবী

খ'সে পড়ে, দেখা দেয় কালের প্রলয়-জলে
সর্বঘ্ন তিমির-তলে অলজ্জ বদ্বীপ,
অমনি থমকে কাল ; অদৃষ্টের কবাল কুহেলি
দীর্ণ ক'রে আদিম পুরুষ
লভে সপ্তদশদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীরে ;
নির্ভয়ে উতরে
স্বগৃহে, স্বরাজ্যে, শান্তির কঠিন তীরে
পুনর্জিত স্বর্গের দুয়ারে।
শিহরে, শিহরে
আজিও সে-কথা মনে হ'লে
এ-জীর্ণ তনুর অন্তরালে
অকাল কঙ্কাল—
যে-মুহূর্তে তরঙ্গিত সময়-সলিলে
দ্বিখণ্ডিত হ'লো ক্রূর অদৃষ্টের শিলা,
ম্লান হ'লো হুতাশন, ব্যর্থ হ'লো যমদণ্ড, ইন্দ্রের কুলিশ,—
বিশ্বাস না হয় যদি, জননীরে শুধায়ে দেখিস।

কিন্তু শেষ শিক্ষা আছে বাকি।
ক্লান্ত আজ স্বেচ্ছাচারী অজ্ঞান বৈশাখী
একদিন উন্মাদ নৃত্যের তালে-তালে
পঞ্জরে যে মুঞ্জরেছে, সঙ্কীর্ণ কঙ্কালে
করেছে সকাম।
স্তব্ধ আজ রলরোল ; বিলোল আকাশগঙ্গা
ঝরে না ঝরে না আর নীহারিকা-স্বপ্নাকুল উৎসুক নিশীথে ;
অন্ধকারে, চন্দ্রালোকে, সন্ধ্যায় নিভৃতে
শরীরসীমান্ত বার-বার
বিচূর্ণ হয় না আর
উপপ্লবী বাসনার বর্বর জোয়ারে।
জরার জটিল রেখা শরীরেরে

কঠিন পাথরে ঘেরে ;
এ-দুর্গম দুর্গে বন্দী, অনাক্রমণীয়,
নিশ্চিন্ত আমার সত্তা ; অনর্গল, অক্লান্ত ইন্দ্রিয়
এতদিনে রুদ্ধ হ'লো। অপরাহ্ণ ছিন্ন-অঙ্গ মেঘে
সবুজ হলুদ নীলে পশ্চিমে অন্তিম
বাসর সাজালো।
সূর্যাস্তের জাদুকর আলোর আয়না
হাতে নিয়ে সন্ধ্যা নামে : অন্ধকারে জ্বলে শুধু ছায়ার, স্মৃতির
অফুরন্ত ভিড়। এ-শরীর অবলুপ্ত জান্তব যৌবনে
হঠাৎ হারায়। কল্পনা বাড়ায় প্রেত-হাত,
দীর্ঘ ছায়া পার হ'য়ে অতীতেরে আনে সে ছিনায়ে।
সেখানে এখন
বিনষ্ট সংকল্প পূর্ণ, সার্থক ধিক্কৃত অনটন,
স্বার্থ-কেন্দ্র-চ্যুত বিশ্ব ফিরেছে আদিম মহিমায়।
জীবনের সমাপ্তি-সীমায়
শেষ শিক্ষা এ-ই ছিলো বাকি।

শিখেছি বৃদ্ধের বিদ্যা। হাস্যকর, নশ্বর, একাকী
ব'সে-ব'সে চেয়ে দেখি দাম্ভিক যুবক-দল চলে কলোচ্ছ্বাসে,
আর দেখি তোরে, ওরে
দেব-বিজয়িনী যৌবন-গর্বিণী কন্যা, রে কন্যা আমার!
সহস্র নলের ছল ব্যর্থ হবে, ফিরে যাবে
ইন্দ্র, যম, বৈশ্বানর ; দুঃখের কুটিল
অরণ্য পুষ্পিত হবে চৈত্ররথ-বনে
তোর যৌবনেরে ঘিরে। সেদিন আমার
কাল-কলঙ্কিত, তুচ্ছ শরীরে তাকায়ে
এ-কথা বিশ্বাস তোর কখনো হবে না—
সহস্র বসন্ত ছিলো আমার যৌবন,
সহস্র চৈত্রের রাত্রি কাটায়েছি মুহূর্তের পরিপূর্ণতায়।

কবে এলো হংসদূত, ক'য়ে গেলো প্রিয়তম নাম,
স্বতঃশ্লথ নীবীবন্ধে আনন্দের ঢেউ তুলে—
সেদিন কখনো ভুলে
ওরে স্বয়ম্বরা, তোর এ-কথা হবে না মনে—
যে-নারীর দেহ এই পৃথিবীতে তোর সিংহদ্বার
এ-প্রণয় তারই উত্তরাধিকার,
এ-বিশ্ববিজয় তারই কাহিনীর পুনরভিনয়।

তাই তো বিনয়
হৃতশক্তি বৃদ্ধের সম্বল।
অপেক্ষার যে-কলাকৌশল
ধৈর্যের যে-চতুরালি ধনী যৌবনের
ব্যঙ্গের বিষয়, দরিদ্র বার্ধক্য তাই দিয়ে
জীবনের ব্যবসার প্রাক্-প্রালয়িক
ভবিষ্যৎহীন দিনগুলি
সযত্নে সাজায়। অবাস্তব, তুচ্ছ, অনর্থক,
পরিত্যক্ত, বিবর্ণ পুতুল—
ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, আর
কয়েকটি হাড়—
এ-ই আমি, এ-ই আমি। তাই বলি
বলি বার-বার,
'অপেক্ষা শেখাও,
শেখাও ধৈর্যের নীরবতা,
এ-বিশ্বে ফিরায়ে দাও আদিম মহিমা।
আমার ইচ্ছার
চক্র থেকে মুক্ত করো সূর্য, চন্দ্র, সমুদ্র, পাহাড়,
তারার জ্বলন্ত নৃত্য, পৃথিবীতে সবুজের খেলা,
আকাশের সোনালি-নীলের মেলা ;
মুক্ত করো জন্ম, মৃত্যু ; আমার প্রেমেরে
প্রেমেরেও মুক্তি দাও ইচ্ছার শৃঙ্খল থেকে—'

আজ তোরে দেখে,
হে নবযৌবনা কন্যা, হে কন্যা আমার,
আমার প্রেমের মুক্তি। দেখি চেয়ে-চেয়ে—
আজিও করাল কাল ঘুমন্ত যেখানে—
পূর্ণিমা-মুখশ্রী তোর, পার্থিব অমরা।
তার জরা
সূর্যের মৃত্যুর মতো
নিশ্চিত, অথচ
অসম্ভব মনে হয়; মনে হয়
কাল, তা-ও তুচ্ছ যেন, এ-বিশ্বের স্থবির ঘটনা,
রূপান্তরহীন।
লক্ষ রাত্রি, লক্ষ দিন
কেটে যায় —না কি আসে ফিরে-ফিরে
মৃত্তিকার মূর্তি দিতে চিরন্তনী দময়ন্তীরে?

হে কাল!

যাও
রেখে যাও ধূসর স্বাক্ষর
হে কাল, হে মহাকাল!
যৌবনের ব্যাকুল বৈকাল
তারে স্তব্ধ করো, স্তব্ধ করো থরোথরো বাসনারে;
ঘনস্মৃতিমেঘভারে
আনো আনো স্তম্ভিত বিষণ্ণ ছায়া
উচ্ছলিত হৃদয়-হ্রদের 'পরে, উন্মথিত হোক্ তার
সঞ্চিত সম্পদ, কর্দমের স্নেহবক্ষে যত উপহার
রেখে গেছে হাজার জাহাজ-ডুবি—

উজ্জ্বল আলোর মতো অলঙ্কার, রক্তের মতো লাল
প্রবাল,
আর কত নিঃশব্দ কঙ্কাল
হে কাল, হে মহাকাল
করো করো উদ্ঘাটিত স্তব্ধ করো যৌবনের উত্তাল বৈকাল।

দাও
দিয়ে যাও হিম হাতে শীত হেনে ;
শতাব্দীর শরীরের শীর্ণতারে
রেখে যাও আমার দুয়ারে
কিরাতের তীরে মরা পশুর শবের মতো।
মৃত্যুর প্রেমেব গান
গুঞ্জরণ করো কানে সূর্যাস্তের হলুদ আলোয়
রেশমের শাড়ি পরা মীনাক্ষীর মতো।
হে কাল, বলো তো
মুমূর্ষু এ-শতাব্দীরে কোন্ মন্ত্র দেবে প্রাণ ?
আমার হৃদয়-হ্রদে হাজার জাহাজ-ডুবি
রেখে গেছে প্রবাল, কঙ্কাল, কীর্তি, কত ব্যর্থতার
ভাঙা হাড়।
তবুও তো কত জন্ম কাঁপে
দেয়ালির প্রদীপ-শিখার মতো ঝিকিমিকি :
হে কাল, তুমি কি
অতীতের ফুঁ দিয়ে নিবায়ে দেবে সব ?
শতাব্দীর ঢেউয়ের আড়ালে কত লুণ্ঠিত প্রাসাদ
আগ্নেয়গিরির সর্বনাশ
কীর্তির উল্লাস,
আর
কত বুভুক্ষার
ভাঙা হাড়।

হে কাল, তোমার ফুঁয়ে
জীবন কি নিবে যায়, রেখে যায় ইতিহাস—স্মৃতি, শুধু স্মৃতি !
প’ড়ে থাকে সূর্যাস্তের হলুদ আলোয়
শীর্ণ শরীর
শতাব্দীর।
গেছে গেছে জীবন যৌবন, গেছে চ’লে হাজার জোয়ার,
হাজার জাহাজ-ডুবি রেখে গেছে বণিকের নাবিকের হাড়,
পাহাড়।

স্মৃতি, শুধু স্মৃতি !
ঐতিহ্যের বিরাট কঙ্কাল—
এই কি তোমার উপহার
হে কাল, হে মহাকাল ?
তুমি কি জানো না
নতুন জন্মের তীব্র উন্মাদনা ?
এই পৃথিবীর
পুরোনো শরীরে আসে বসন্তের দস্যুতার ভিড় ;
কোনো নিদ্রাহীন রাতে
আমারও শরীর যেন মুঞ্জরিত হ’তে চায়
আকাশে জ্যোৎস্নাতে।
তুমি কি জানো না
নতুন সৃষ্টির তীব্র উদ্দীপনা
বসন্তের বীজে
পূর্ণ ক’রে দেবে এই শীর্ণ শতাব্দীর
শরীর।
বসন্তের সেনানীর পদধ্বনি
তুমি কি জানো না ?   তুমি কি শোনো না ?
তুমিই কি নও
দূর হ’তে শোনা সেই গুরুগুরু বজ্রধ্বনি ?

তোমারও কি নয়
নতুন জন্মের তীব্র ব্যথা, আর বসন্তের বিশাল পূর্ণতা,
ঐতিহ্যের কঙ্কালের পরে
সৃষ্টির উচ্ছ্বাস ?
আমাদের হৃদয়ের উল্লসিত
বসন্তবেলায়, যৌবনের বিবাহ-বাসরে, হে কাল, তুমি তো
পূর্ণতার পুরোহিত,
তুমি কি কেবল
হিম হাতে হানো শীত ?
উন্মথিয়া তোলো
গতিহীন গলিত অতীত ?
তোমার করাল ফুঁয়ে
জীবন কি নিবে যায় প্রদীপ-শিখার মতো ?
বলো তো, বলো তো,
তুমি কি স্থবির ? তুমি কি অস্থির ?
তোমারই নিভৃত গর্ভে অতীতের গতিশীল রূপ,
ইতিহাস জীবন্ত জন্তুর মতো প্রতিহিংসা খোঁজে ;
তোমারি অদৃশ্য হাত পলে-পলে তিলে-তিলে
ভ'রে তোলে স্মৃতির কঙ্কাল ।
কীর্তির উজ্জ্বল অহঙ্কার
সূর্যের আলোর মতো অলঙ্কার
সে তোমার, সে তোমার,
আর
দিনে-দিনে, তিলে-তিলে মুঞ্জরিত প্রাণ-পুঞ্জ, রক্তের মতো লাল
প্রবাল ।

হে কাল, হে মহাকাল, তোমারি তো,
তোমারি তো আমাদের হৃদয়ের উল্লসিত
সৃষ্টির উৎসাহ, আমাদের শরীরের

বসন্ত-বাসনা ; জীবনের, যৌবনের
দিগন্ত-ক্ষুধিত বন্যা, ঢেউয়ের আড়ালে কত
প্রচণ্ড ইচ্ছার অগ্ন্যুৎপাত,
প্রেমের উত্তাপ,
আর
কত পূর্ণতার
অঙ্গীকার।

বিরহ

ব'হে যায় বিরহের নদী।
যত দূর দেখা যায়, দিগন্ত-অবধি
জল, শুধু জল।
আবর্তিত, উন্মথিত, ফেনিল, উচ্ছল
কালের করাল স্রোত হতাশার পাকে এঁকে-বেঁকে
যায়, ব'য়ে যায়। হত্যাকারী ফণিমনসায়
আচ্ছন্ন এ-তীর। এয়োতির সিন্দূর এখানে
রক্ত হ'য়ে ঝরে। জীবনের কানে-কানে
কঙ্কালেরা চুপি-চুপি কথা কয় ; যায়
ঝ'রে যায় জীবনযৌবন ;
হৃদয়ে বসন্তবন
ধুলায় বিলীন হ'লো। পিঙ্গল পিশাচ-আলো
মুমূর্ষুর প্রলাপের মতো ইতস্তত
আকাশে প্রান্তরে
অন্ধকারে উচ্চকিত করে।
রাত্রি আসে আকাশে অরণ্যে জলে ; জল-কলকলে,
বাতাসের অন্তিম নিঃস্বনে
শোনা যায় নরকের রলরোল, মড়কের লোলজিহ্ব অট্টহাসি ;

সর্বনাশী
অতল তিমির নামে, এ-কবন্ধ আলো তারি দূতী।
অন্ধকারে কেঁদে মরে রক্তাক্ত প্রসূতি
সন্তানের মূর্তি দেখে। অবশেষে
মৃত্যুরে সে
মৃত্যুরে কি জন্ম দিলো দীর্ণ হ'য়ে প্রসবব্যথায় !

কোথায়, কোথায়
তুমি, হে প্রিয়, হে প্রিয়তম ?
সময়ের সঙ্গমলীলায়, অত্যাচারী তরঙ্গের তালে-তালে
হত্যাকারী অন্ধকারে তুমিও কি তুমিও লুকালে ?
এ-কুটিল কালো জলে নেচে চলে
ফণা তুলে দন্তিল, সর্পিল ফেনা,
আকাশে আতঙ্ক কাঁপে। বাঁচে না, বাঁচে না
এ-জীবন তোমারে হারায়ে,
হে প্রিয়, হে প্রিয়তম। দাও, দেখা দাও।
তোমার সন্ধানে ফিরি ছ'হাত বাড়ায়ে
অরণ্যে, আকাশে, জলে, পর্বতচূড়ায়,
অগ্নিগিরি-উদ্গীরিত লাভার কর্দমে,
পৃথিবীর ধাতব-উত্তপ্ত গর্ভে, গন্ধক-স্ফূরিত
পাতালে ; তোমারে খুঁজি উন্মত্ত মৃত্যুর
শাণিত কুক্কুর-দন্তে ; বিষবাষ্পে দুর্গন্ধি, আবিল
অন্ধকারে ; নির্বীজ পাষাণে ; প্রান্তরের
অকর্ষিত শূন্যতায়, সর্বঘ্ন হিংসার
লেলিহান ধ্বংসে ; এই বন্ধ্যা ফণিমনসার
তীরেও তোমারে খুঁজি,
হে প্রিয়, হে প্রিয়তম ; ডাকি তোমারেই
নরকের রলরোল ভেদ ক'রে, প্রলয়ের জল-কলকলে

তোমারই আশ্বাস যেন শুনি। কোথায়, কোথায় তুমি ?
রাত্রি নামে, পৃথিবীর চিরপ্রসূতির
কান্না শোনা যায় ; আচ্ছন্ন দু' তীর
দুর্গন্ধি মৃত্যুর ধূমে ; ব'য়ে চলে অবিরল কাল
হতাশার পাকে-পাকে এঁকে-বেঁকে। এ-তিমির
তোমারই বিরহ, প্রিয়, এ-আশার দুঃসাহসে
আছি ব'সে,
কঙ্কাল-বেষ্টিত, পীত-লোহিত সন্ধ্যায়।
দূরে শোনা যায়
গন্ধকের বিস্ফোরণ, অগ্নিগিরি-উদ্গীরিত লাভা
এঁকেছে বীভৎস আভা
আকাশের পিঙ্গল ললাটে। কোথায়, কোথায় তুমি ?
এলো, ওরা এলো ! পৃথিবীতে মৃতের, রিক্তের,
ছিন্ন-অঙ্গ কবন্ধের ভিড়, অপুত্রীর
অভিশাপ, অকর্ষিত প্রান্তরের দুঃসীম শূন্যতা।
হে প্রিয়, কোথায় তুমি ?
কঙ্কালের দীর্ঘশ্বাসে শুনি
নেই, তুমি নেই।
জ্বলন্ত লাভার
ভীষণ অক্ষর বার-বার
আকাশে, অরণ্যে, জলে লিখে যায় অন্তিম হতাশা—
সর্বশেষ আশা—
নেই, তুমি নেই।

ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা

ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা,
শেষ তব শীর্ণ ছায়া শুষে নিলো আজ
শুভ্র সভ্যতার সূর্য।
করো, জয়ধ্বনি করো,
ছিন্ন হ'লো ঘন অন্ধকার
মেঘবর্ণ মেখলা লুণ্ঠিত—
ঐ এলো প্রেমিক বণিক-বীর
তব নগ্ন কৌমার্যেরে ত্বরিতে করিতে
সভ্যতাসন্তানবতী
দীর্ণ তব হৃৎপিণ্ডের রক্তের যৌতুকে।

হে আফ্রিকা, হও গর্ভবতী।
আনো আনো বাণিজ্যের জারজেরে
দ্রুত তব অঙ্কতলে।
পূর্ণ হোক্ কাল।
স্থূলোদর লোলজিহ্ব লোভ
রক্তস্ফীত বাণিজ্যের বীজ
হোক পূর্ণ হোক।
করো,
বিকলাঙ্গ, পক্ষাঘাত-পঙ্গু, নপুংসক বিকৃত জাতক,
তার জয়ধ্বনি করো।
উন্মত্ত কামার্ত ক্লীব, আত্মরক্ষা আত্মহত্যা তার।

হে আফ্রিকা,
অবসন্ন বণিকবৃত্তির নিহিত মৃত্যুর 'পরে
বিদ্যুৎ-চমকে
কালের কুটিল গতি গর্ভবতী করিবে কঙ্কালে।

হে আফ্রিকা, হে গণিকা-মহাদেশ,
একদিন তব দীর্ণ বিষুবরেখার
শতাব্দীর পুঞ্জ-পুঞ্জ অন্ধকার
উদ্দীপিত হবে তীব্র প্রসব-ব্যথায়।
করো,
মৃত্যুরে মন্থন করি' নবজন্ম কাঁপে থরোথরো,
জয়ধ্বনি করো।

বাঙালি বুদ্ধিজীবী, ১৯৪০

১

যুক্তি গাঁথি, তর্ক ফাঁদি ; শ্রেষ্ঠ মানি মানুষী মনীষা ;
অনাক্রমণীয় আস্থা নিরপেক্ষ, বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে ;
আমরা ভালোমানুষ, কারো পাকা ধানে মই দিতে
ইচ্ছা নেই ; সত্যানুসন্ধিৎসা নেশা, তাই এ বচসা।
অর্থাৎ সম্প্রতি বাদ-বিসম্বাদে হারায়েছি দিশা।
দলে নেই, ছলে নেই ; রিক্‌শাওলা, কুলি না-হ'য়ে যে
অধ্যাপক হয়েছি, এ-সৌভাগ্য যথেষ্ট ঘ'ষে-মেজে
স্বদেশ, সমাজ আর স্ত্রী-পুত্রের সেবাই উচ্চাশা।

বেশ তো! চাষীর দুঃখ দূর করো, নাও তাড়ি কেড়ে
মজুরের! তা ব'লে কি ষণ্ডামির প্রশ্রয়—আরে ছি!
ও-সব তো প্রপাগাণ্ডা! তাই মানো? কী ছেলেমানুষি
সার সত্য শোনো, মাথা ঠাণ্ডা করো ; হৈ-চৈ ছেড়ে
ভাবো তো, মুখে যা বলো, সত্যি তা-ই হয় যদি—তবে
সব যাবে, সব যাবে, একেবারে সর্বনাশ হবে।

২

ভয়? না, কিসের ভয়? বিভিন্ন বিরোধী তথ্য ঘেঁটে
সত্য খুঁটে বার করি বুদ্ধির ধারালো চঞ্চু দিয়ে—
বিজ্ঞাপনে ভুলি না, স্বাধীন চিন্তা করি। ভীরুতা এ?

নির্ভয়ে বিশ্বাস করি মানুষ বাঁচে না শুধু পেটে,
মতের মুক্তিও চাই (নয়তো তর্ক জমবে কী নিয়ে?)
শিল্প, ধর্ম, বিজ্ঞান, বাণিজ্য মানি। ভীরুতা এ?

তবে যদি সুবুদ্ধিরে ভীরুতার আখ্যা দাও, বেশ—
দুর্ভিক্ষ, অরাজকতা, অত্যাচার, এই যদি ভালো
মনে করো, রক্তমেঘে সভ্যতার শুভ্র শুভ আলো

নেবাতে চাও, তাহ'লে—শাস্তি তার পাবে হাতে-হাতে
নিশ্চয়। দুঃখিত, ভাই, কিন্তু অন্য উপায়ও তো নেই!
সভ্যতার দায় বড়ো দায়।···আমি বলি, কেন এই
হৈ-চৈ? যা আছে থাক না তা-ই। অন্যায়?···আছেই।
উন্নতির চেষ্টা কবো, হয়তো শিকে ছিঁড়বে বরাতে।

কোনো কবি-বন্ধুর প্রতি

জীবিকার নিরানন্দ অন্বেষণে ঘুরি রাজপথে।
মন্থর, মসৃণ ট্র্যামে, ক্ষিপ্রগতি কিন্তু উৎকেন্দ্রিক
বাস্-এ, কিংবা (তাপমান শতাধিক!) রুষ্ট পদাতিক।
বহু চেষ্টা ব্যর্থ হ'লো; এবার কি হবে কেল্লা ফতে?
ঘুরবে কি চাকা? বহুবার প্রবৃত্তির প্রিয় ব্রতে
ভ্রষ্ট হ'য়ে, প্রতিভারে পণ্য ক'রে ঘৃণ্য ব্যবসার
ব্যভিচারে—তবু, তবু মেটে না আক্ষেপ, অবসর
জোটে না ক্ষণিক; অবরুদ্ধ প্রয়োজনে।

ব্রত হ'তে
মুক্তি চাই, বিবেক করে না ক্ষমা। বিবেক ? অথবা
অক্ষমের ছদ্মবেশী ভয় ? মূঢ় যারা, ক্রূর যারা,
হিংস্র লোভে অকুণ্ঠলুণ্ঠনকারী, তারাই তো জয়ী।
আমি, তুমি পরাজিত···ক্রীতদাস। কল্পনা-আশ্রয়ী
কবি শুধু! ···তবু আত্মরক্ষা ইষ্ট। শিল্পের অমরা
অগত্যা প্রত্যয়। আর পরস্পরে বিষণ্ণ বাহবা।

চলচ্চিত্র

ট্র্যামে আর বাস্-এ
ঘাম, চুরুটের ধোঁয়া, দু' পয়সার সাপ্তাহিক, গরম অসহ্য গরম।
ফিরিঙ্গি মেয়ের ব্রণ-ফোটা মুখে
পাউডর-প্রলেপ। চাঁদনির এগারো টাকার স্যুটে
শোভনশরীর রাকেশলোভন
বেকার, বীমার দালাল। বড়োকর্তা সাক্ষাৎ কার্তিক,
তার উপর অহিংস কংগ্রেসপন্থী, নিরামিষভুক,
মৃত মাংসে রুচি নেই, জীবন্ত মাংসের পণ্যে বনেদি খদ্দের ;
নন্দেরদুলাল কায়েমি দালাল। আহা তার
কাজটা জুটতো যদি! তবে কি ছুটতে হ'তো
বাগবাজার বালিগঞ্জে ইতস্তত
হতাশ্বাস ঊর্ধ্বশ্বাসে
ট্র্যামে আর বাস্-এ!
ট্র্যামে আর বাস্-এ
ভিড়, বিড়ি, রেস্-টিপ্, ছাত্রদের খিস্তি, আর
গরম অসহ্য গরম।

বিবাহের আশা নেই, বনানীর তাই এম.এ. পড়া,
ছেলেরা বেঁধেছে ছড়া ;
নেহাৎই মোটার নেই, নয়তো এ-বাস্-এ চড়া—
ছি !
ফর্শা রং, আঁটো মাংস—পুরুষের তা-ই প্রেমে পড়া।
সকলেই একবার, অথচ দ্বিতীয়বার কেউ
তাকায় না তার দিকে। অতি নিরাপদ
কৌমার্যের বোঝা ব'য়ে প্রতিদিন জোটে এম.এ. ক্লাশে
অগত্যা অসভ্য বাস্-এ
বনানী ভট্‌চায।
হবেন তো বড়ো জোর কেরানি কি ইস্কুলমাষ্টার
লজ্জা নেই, তবু লজ্জা নেই। গান গায়, বাঁধে ছড়া—
ছি !
পাৎলুন আঁটলুম, বড়োলোক চাটলুম, এখন তাহ'লে করা
কী ?

কী ? কী ?
কী করি ? কী করি ?
জীবনটা থোড় বড়ি
খাড়া, বড়ি খাড়া থোড়, তবে কি গলায় দড়ি ?
না কি জলে ডুবে মরি ? ট্যাকে নেই কানাকড়ি,
নই ধড়িবাজ বাটপাড়। এই নিয়ে আটবার
চাকরির চেষ্টা ব্যর্থ হ'লো। ভদ্রবংশজাত, বি. এ.,
সচ্চরিত্র (বাধ্য হ'য়ে), পরিশ্রমী (হায় পণ্ডশ্রম !)—
আর কত আনাগোনা ঘামে ছেঁড়া সুপারিশ নিয়ে
মুরুব্বিবিহীন
হতাশার গোলকধাঁধায় !
আর কত দিন
দুর্ভিক্ষ লুকিয়ে রাখা মলিন পাৎলুনে !

ছুটোছুটি, কাঁদাকাটি, সাক্ষাতে পা চাটা, আর আড়ালে নির্ভীক
স্বাধীন সমালোচনা, আনন্দবাজারি উত্তেজনা
রেস্তোরাঁয়, ছ'পয়সার চায়ে, আর কত দিন
মনসা স্ত্রীমাংসতীর্থে অবাধ ভ্রমণ !
বিজ্ঞাপনে লাস্যময়ী, সিনেমার প্রাচীরপঞ্জীতে
যেন বিশ্ববাসনার শতদল (চয়নিকা পড়েছি বি. এ.-তে)—
আর সিনেমায়—আহা, মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছি,
এ-স্বপ্ন সুদীর্ঘ, স্পষ্ট, সব ইচ্ছা পূর্ণ হ'লো, এলো
লেক-পাড়ে মার্বেলপ্রাসাদ, চোখ বুজে চেক সই করা,
একাধিকা প্রাণাধিকা, ড্রেস্-স্যুট, মস্ত মোটার।
এই স্বপ্ন-স্বর্গ থেকে রূঢ় জেগে-ওঠা
পায়ে হেঁটে ছ' নম্বর পীতাম্বর লেনে
কাংস্যকণ্ঠা জননীর, স্বর্গগত পিতার পাঁচটি
আপোগণ্ড সন্ততির সুখসঙ্গে ফেরা
আর কত দিন !
তবে এই কি জীবন
তবে এই কি জীবন
এ যে জীবনে মরণ দেখি মরণই জীবন।
আর মানে না বারণ
স্ত্রীমাংসের তীর্থগামী মন।
বিজ্ঞাপনে ল্যাস্যময়ী, সিনেমায় প্রণয়রূপিণী
সেই তুমি
মূর্তিতে কি দিবে ধরা ?
দেখি, শুধু চেয়ে দেখি
ফুটপাথে, ট্র্যামে আর বাস্-এ,
আশে-পাশে, পার্কের সবুজ ঘাসে
ফিরিঙ্গি মেয়ের
মেদভারে গর্বিত বক্ষের তীক্ষ্ণ রেখা,
কলেজের ছাত্রীদের চোখে চঞ্চলতা,

সন্ধ্যায় উজ্জ্বল শাড়ি, পটে আঁকা মুখ—
মনে-মনে—শুধু মনে-মনে—
অফুরন্ত অবাধ ভ্রমণ !
এই বাস্-এ একজন কলেজের দিকে যায় রোজ,
মোটা,
কুৎসিত সন্দেহ নেই,
তবু—
অন্তত হতাম যদি কেরানি কি ইস্কুলমাষ্টার !

পূর্বরাগ

১

এবার তবে ঝড়।

পাষাণ-কালো আকাশে আলো ক্ষণিক কাঁপে
দ্বিপ্রহর হ'লো প্রখর স্নায়ুর তাপে
রাত্রিদিন চিরমলিন কর্মহীন।

বুদ্ধিজীবী রুদ্ধঘরে সঙ্গীহীন
আত্মরতির সম্মোহনে কাটায় দিন।
পাষাণ-কালো আকাশে আলো কখন্ কাঁপে ?

ক্ষুব্ধমনে রুদ্ধঘরে একলা যাপে
বুদ্ধিভোগী পাণ্ডুরোগী রক্তহীন।
প্রেম তো শুধু বায়লজির দাবি মেটায়।

গণমনের আন্দোলনের আবর্জনা
ব্যর্থ শ্রমে অর্থাগমের বিড়ম্বনা
চারিদিকেই পোড়ো জমি, ফাঁপা মানুষ,
শান্তি শুধু গ্রন্থাগারের অন্ধকারে।

এবার তবে ঝড়।
এবার তবে বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ নখে
পাষাণ-কালো আকাশ যাক ছিঁড়ে,
এবার তবে দীপ্ত দারুণ তরুণ চোখে
আশার লাল মশাল।

আকাশ-ভরা আলো।
দীপ্ত দারুণ তরুণ চোখের আগুন জ্বালো
রুদ্ধঘরের অন্ধকারের পাষাণ-পটে
তীব্র আশার অঙ্গীকারে।

চিরবিরস অবসরের শিথিল জরা
অর্থাগমের তিক্ত শ্রমে নিত্য মরা।
শান্তি শুধুই গ্রন্থাগারের অন্ধকারে?

মূঢ় ইতর ধূর্ত লোলুপ স্বার্থপর
গণমনের জন-নায়ক জয় হে!
—তুচ্ছ করার অভিনয়ে সহ্য করা
মিছিমিছি ছটফটিয়ে কী হবে!

এবার তবে নতুন করো।
তনুমনের তরুণতার আগুন জ্বালো
মুক্ত প্রেমের দীপ্ত শাণিত দুঃসাহসে।
—হায়রে ভীরু আত্মকামে শৃঙ্খলিত!

শিথিল স্নায়ু শীতলশিরা রক্তহীন
উচ্চচূড় আলস্যের অকাল জরা
ব্যর্থতার তিক্ততায় নিত্য মরা—
প্রেম কি শুধু বায়লজির দাবি মেটায় ?
—হায়রে ভীরু ক্ষুদ্র কামে শৃঙ্খলিত !

পাষাণ ফেটে আকাশে ফোটে আশার রংমশাল,
কর্মখর দ্বিপ্রহর দীপ্ত হ'লো,
কবি-কিশোর, শক্তি তোমার মুক্ত করো,
বৃহন্নলা, ছিন্ন করো ছদ্মবেশ।

২

ভাঙাও ভাঙাও সূর্যের ঘুম তবে,
জাগাও জাগাও শিশু-সূর্যের কুঁড়ি,
জ্বালাও জ্বালাও ভাঙা হৃদয়ের শুকনো ডালে
সূর্যের মঞ্জরী।

পাষাণ ফেটে আকাশে ফোটে আশার রংমশাল
দিগন্তে লাল আগুন জ্বলে,
রাত্রি কাঁপে বিদ্যুতের তীব্র চাপে,
জীর্ণ জরা ঝরার এলো দিন।

রাত্রি হ'লো তরুণী, তারে বরণ করো,
সীমন্তে তার শত তারার সীমান্ত,
অন্ধকারে যৌবনের বহ্নিগান
পাষাণ-ভাঙা আকাশে করে রাঙা।

পাষাণ-ভাঙা আকাশে রাঙা আগুন জ্বলে
চৈত্র হাওয়ায় মুক্ত প্রেমের পদধ্বনি
আত্মরতি-মুক্ত প্রেম মৃত্যুহীন
দীর্ণ করে ক্ষুদ্র ঘরে রুদ্ধ দিন।

এবার তবে ধরণী হবে তরুণী, তারে বরণ করো,
রক্তে জ্বালো দুঃসাহসের বহ্নিগান।
জীবনে করো নতুন, আর যৌবনেরে তরুণতরো,
এবার সবি নতুন করো।

ঝরাও ঝরাও জীর্ণ জরার হলদে পাতা,
ছড়াও ছড়াও সূর্যের লাল বীজ।
জ্বালাও জালাও ভাঙা হৃদয়ের শুকনো ডালে
সূর্যের লাল উজ্জ্বল মঞ্জরী।

পৃথিবী সূর্যের শিশু, আমরা যে সূর্যেরি সন্তান।
কতকাল, কতকাল এ-উজ্জ্বল উত্তরাধিকারে
বঞ্চিত, বাঁচিবে প্রাণ? উদ্দাম, আদিমতম পিতা,
হে সূর্য, হে মহাবীর্য, তোমার বন্দনাগান যদি
আমারও আনন্দগান নাহি হয়, ব্যর্থ তবে সব
কারুশিল্প, কবিতার বাণীমূর্তি। দাও ফিরে দাও
তোমার জ্যোতির স্পর্শ আমাদের রক্তে, হে ভাস্বর,
আঁকো তবে জ্বলন্ত স্বাক্ষর মর্ম-মূলে। বিস্মৃত অতীত
শত লুপ্ত শতাব্দীর সুরঙ্গে জাগায়ে প্রতিধ্বনি
তোমারি উত্তাল নৃত্যে আবর্তিত করুক রক্তের
তপ্ত স্রোত; সে-দিন আসুক ফিরে, যে-আদিম দিনে
তোমারি বীর্যের বীজে গর্ভবতী হ'তো এ-পৃথিবী,
তোমারি মঞ্জরী ছিলো মানুষের দীপ্ত বংশাবলী।

ফোটাও, ফোটাও শিশু-সূর্যের কুঁড়ি
হে বীর, কবিকিশোর,
তামসী রাত্রি, থমথমে ঘুমে রুদ্ধশ্বাস
হানো তার বুকে চৈত্র হাওয়ার সর্বনাশ,
রাত্রিশেষের দুঃস্বপ্নের পাষাণ-পটে
ঝলসি' উঠুক তোমার বাহুতে সূর্যের তলোয়ার
বসন্তদিন এলো বুঝি ঐ এলো।

এ-দীর্ঘ ঘুমে হানো, হে বীর কবিকিশোর,
দীপ্ত দারুণ সূর্যের উজ্জ্বল তলোয়ার,
নব বসন্ত আনো ভাঙো দুরন্ত দক্ষিণ,
চৈত্র-রাতের স্বপ্ন-ভাঙানো স্বপ্নের ঝড় তোলো,
আসে বসন্তদিন।

৩

এসো তবে গড়ি সূর্যের মন্দির।
আনো সৌরভ, আনো সঙ্গীত সঞ্জীবনী,
হানো আকাশে অশান্ত আনন্দধ্বনি,
আনো অকুণ্ঠ নির্ভয় প্রণয়বাণী
আনো নৃত্যের চঞ্চল মঞ্জীর।
দ্যাখো, গলিত তুষাররাশি স্বপ্নচূড়ায়
ঝরে নির্মম কর্মের ঝরনাধারায়,
লাগে বুদ্ধিতে উৎসাহী হাওয়া;
করো চিরযৌবনা এই ধরিত্রীরে,
দাও মুক্তি শৃঙ্খলিত প্রবৃত্তিরে,
হিংসুক প্রকৃতিরে তৃপ্ত করো।

যার লাঙল চলে তারি ফসল ফলে এই সৌর রীতি।
হল- কর্ষণে স্বর্ণিল শস্য ঝলে, দিগন্তে স্বর্ণিমা উজ্জ্বল হে।
প্রিয় কর্মের উৎসাহে মুক্ত জীবন,
প্রিয়া- সঙ্গমে রক্তের উত্তরায়ণ,
আজ প্রেমের ঋতু ওরে প্রেমের ঋতু।

দিগন্তে স্বর্ণিল শস্য আন্দোলিত উর্মিল বাতাসে।
ইতিহাস মৃত্যুহীন। কালের কুঞ্চিত যাত্রাপথে
পুরোনো স্মৃতির স্তূপ—শুধু স্মৃতি ? না কি পূর্ণতায়
সর্পিল সোপান ? হে বন্ধু, দুর্গম এই আরোহণী
সঙ্কীর্ণ, শঙ্কিল ; তবু যাত্রা করো। দূরে দেখা যায়
সূর্যের মন্দিরচূড়া উঠে গেছে উদ্দাম আশ্বাসে
স্বপ্ন-নীহারিকাচ্ছন্ন কল্পনার জ্যোতিষ্ক-আলয়ে।
যদি সেথা যেতে পারো, যদি সেই মহান নির্জনে
বক্ষ তব নাহি কাঁপে, আঁখি তব ঘুমে নাহি ঢুলে,
তবে সেই তারা-জ্বলা রুদ্ধশ্বাস চূড়ায় দাঁড়ায়ে
চেয়ে দেখো পৃথিবীর উতরোল বসন্তবন্যায়,
সূর্যের মঞ্জরী জ্বলে মানুষের অনন্ত সন্ততি।

তখন কবিরে তুমি ক্ষমা কোরো। ভেবে দেখো মনে,
যদিও সে-পলাতক মূঢ়, গ্রাম্য কুম্ভকারসম
আপনার কারুকর্মে ব্যস্ত ছিলো, যবে রাজপথে
জন-গণ-নায়কের জয়ধ্বনি ছিঁড়েছে আকাশ ;
যদিও সে-অজ্ঞ মন মগ্ন ছিলো ধ্বনির কুহকে,
প্রিয়ার বেণীর পাশে যদিও সে, নির্লজ্জ, জড়িত ;
তবু তারি সৃষ্টি এই তারা-জ্বলা রুদ্ধশ্বাস চূড়া,
তথাপি এ-মন্দিরের উজ্জীবনী মন্ত্র তারি বাণী :

'সূর্যদেব, উদ্দাম, আদিমতম পিতা, হও তুমি
আজ হ'তে আমাদের একমাত্র, একচ্ছত্র রাজা,
অরাজক এ-জগৎ অজারজ হোক পুনর্বার,
দাও নব পৃথিবীরে উল্লসিত সৌর নরনারী।'

৪

এবার তবে বসন্তদিন।

ঝরিয়ে দিলো জীর্ণ জরার শুকনো পাতা
রুদ্ধ ঘরে রুদ্ধ মনের পাণ্ডুরতা
কর্মহীন আলস্যের ব্যর্থ দিন
চৈত্র হাওয়া দুরন্ত।

তীব্র আশার দৃপ্ত জয়ের উদ্দীপনা,
মুক্ত প্রেমের দীপ্ত পথের উন্মাদনা,
দুঃসাহসের উচ্চকিত উজ্জীবনা,
শান্তি আঁকা বাঁকা চাঁদের ইঙ্গিতে।
এলো উতল বসন্ত।

চৈত্র হাওয়ার স্বপ্ন-ভাঙা স্বপ্ন-ঝড়ে
আলস্যের হতাশ্বাস ধুলায় ঝরে,
চমকে ওঠে বুদ্ধিজীবী রক্তহীন—
হঠাৎ এ কী মুক্তি, কী আনন্দ!

তিক্ত শ্রমে অর্থাগমের ব্যর্থ দিন
চৈত্র হাওয়ায় হলদে পাতা,
কর্ম সে তো মুক্তি-পথের নৃত্য-লীলা,
ক্লান্তি আনে ঘুমের গানে শান্তি-ঝরা
চাঁদের চির লাবণ্য!

চৈত্র হাওয়ায় মৃত্যু হ'লো শুকনো পাতা—
আবশ্যিক আলস্যের অকাল জরা,
ব্যর্থতার তিক্ত শ্রমে নিত্য মরা—
কর্ম সে তো শ্যামল শাখে ফুল ফোটানো,
ক্লান্তি শুধু ঝরায় জরা।
এবার এলো বসন্তদিন।

আকাশ-ভরা আলো।
দীপ্ত চোখে যৌবনের বন্যা জ্বালো।
মরণে করো উদ্‌যাপন, জীবনে করো উজ্জীবন,
বাতাসে হানো সূর্য-ঝরা বীজ ;
কল্পনারে মুক্ত করো, কর্ম-রথে যুক্ত করো—
সব্যসাচী, তোমার হোক জয়!

কবিজীবনী

পুরোনো পাথরে ব'সে সুনন্দা সেদিন
'বরং, অজ্ঞাত, অজ্ঞ, কাটাও আষাঢ়
পাটখেতে হাঁটুজলে ; বরং শৌখিন
চিন্তাহীন সাঁওতাল পুরুষ হও, যার
দিনগুলি খনির তিমিরে মৃত, তবু
মৃত নয়, তবুও বসন্ত আসে, হাওয়া
হানে দুরন্ত দক্ষিণ, ভাঙে জবুথবু
জীবনের বেড়ি, গন্ধ ছড়ায় মহুয়া,
জড়ায় নির্লজ্জ হাত যুবতীর কটি।
আমি বলি, বরং বঞ্চিত হও, হও
অন্নহীন অন্নদাতা, হও তৃণ, মাটি,

অনামি খনিক, করাল রৌদ্রের দিনে
রাজপথে উত্তপ্ত পাথর ভাঙো, তবু
তবু বলো মনে-মনে, "রোগে দুঃখে ঋণে
বুভুক্ষায় জীবন বিনষ্ট আমাদের,
সন্তানেরা দগ্ধ ধান্যমঞ্জরীর মতো,
নিরুপায় প্রয়োজনে বন্দিনী জায়ারা।
আমরা মৃত্যুর, তবু জীবন জীবিত
আমাদেরই পশু-শ্রমে। (আমরা মৃত্যুর,
তবু নই সে-বিদ্যার ক্রীতদাস, যার
বশ্যতায় যাপে দিন ধূর্ত সুচতুর
রাজমন্ত্রী পুরোহিত দিক্‌পালের দল,
আততায়ী ব্যবসায়ী, দৈনিকপত্রের
পতাকায় সমারূঢ় যারা ; উচ্চ চূড়া
সমাজের ; উদার, পরোপকারী, কৃতী,
সংসারী সজ্জন আর সুমেধী সন্ন্যাসী।
ক্রূর যারা, ঐশী যারা, যারা পৃথিবীর
আত্ম-বৃত নেতা, তারা যে-বিদ্যায় দক্ষ
লোকে যার সুবুদ্ধি রটায় নাম, তার
স্পর্শে ঘৃণ্য নই, যদিও মৃত্যুর যূপে
আমরা আজন্ম বলি।")
বলো এই কথা।'

আকাশে ঘনালো সন্ধ্যা শ্বাপদের নিঃশব্দ সঞ্চারে।
একবার তাকালাম সুনন্দার পাণ্ডুর মুখের
দিকে, একবার সাঁওতালি পিঙ্গলরঙ্গী আঁকাবাঁকা
প্রান্তরের দিকে, যেখানে সন্ধ্যার সোনা দিগন্তের
নীলাভ পাহাড়ে জ্ব'লে গ'লে গেলো। তারপর আমি :

'সুনন্দা, তুমি কি ভাবো জীবনের পন্থা নির্বাচন
আমাদের হাতে ? জন্মাতে চাইনি, তবু জননীরে
দীর্ণ হ'তে হ'লো, জন্ম নিতে হ'লো। হ'তে হ'লো কবি—
সে কি আমার ইচ্ছায় ? তুচ্ছ হই, হই তৃণ, মাটি,
তবু তো অক্লান্ত এই ছন্দের বুনোন, আনন্দিত
পরিশ্রম, কথার কঠিন কারুকলা। আমি যেন
মূঢ় গ্রাম্য কারুকর্মী, পৃথিবীর শাসকশ্রেণীর
প্রভাব-প্রসাদ-মুক্ত, ঘর্মক্ষর উৎসাহে কাটাই
সারা দিন ; কত সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের ছায়া এসে পড়ে
কত আলো চকিতে মিলায়, সেই সব পলাতক
আলো-ছায়া ফোটাই রূপের ছন্দে ; যৌবন ফুরায়,
জীবন নিঃশেষ হ'য়ে আসে, তবু ম্লান দিনান্তের
অস্পষ্ট আলোয় ব'সে ছন্দ বুনি, কানে শুনি কোন
অপরূপ ধ্বনি, যার সন্ধানের উদ্দীপনা দূর
করে মৎসর জরার গ্লানি। যেমন মাঠের শস্য
খনিজ ঐশ্বর্যরাশি সুবুদ্ধির অপেক্ষা রাখে না,
তেমনি আমারও কর্ম যে-অগাধ অজ্ঞতা-সঞ্জাত
সেখানে সুবুদ্ধি ব্যর্থ, ব্যর্থ সব পার্থিব বিদ্যার
চতুর কৌশল ; যতবার নাগরিক প্রলোভনে
উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে আরোহণে সচেষ্ট হয়েছি,
ততবার, পরাজিত, ফিরেছি আপন মূঢ়তায়,
অজ্ঞান স্বধর্মে, জরা-জয়ী কারুকর্মে, ঘর্মক্ষর
কিন্তু ক্লান্তিহর পরিশ্রমে। আমার জীবন এই।
ইচ্ছা নেই, অনিচ্ছাও নেই এতে, আছে আবশ্যিক
অঙ্গীকার, মৃত্তিকায় প্রতিশ্রুত যেমন কৃষক।
মাঠে যারা ধান কাটে, পাটখেতে কাটায় আষাঢ়,
রাজপথে উত্তপ্ত পাথর ভাঙে, তারাও জানে না
এই ধৈর্য, এ-নির্মম শ্রম, আমি যাতে ছন্দ বুনি।

আমার যে মুক্তি নেই, এই মুক্তি ; যে-কর্মের চক্রে
বাঁধা আছি, আবদ্ধ তাতেই—এ যদি সৌভাগ্য হয়
এ-সৌভাগ্য জৈব ধর্ম, মানুষ বঞ্চিত শুধু এতে
মানুষেরই লুব্ধ ধূর্ততায়। বসন্তে যেমন গাছ
ফোটায় নতুন পাতা, তেমনি কর্মের প্রেরণায়
মুঞ্জরে মানুষ, এই স্বত্ব এ-বিশ্বে ফিরায়ে আনো।
হাঁটুজলে মাঠে যারা কাটায় আষাঢ়, যারা নামে
খনির তিমিরে, করাল রৌদ্রের দিনে রাজপথে
হাঁটু ভেঙে খাটে যারা, মৃত্তিকার, খনির, যন্ত্রের
ঐশ্বর্য তাদেরই। তাদেরই তা হোক। আনন্দের উৎস
হোক সকলেরই স্বীয় শ্রম—কৃষকের, যন্ত্রীর, কবির।'

ছিন্ন সূত্র

চৈত্র মাসে দুপুরবেলায়
পাতা-ঝরা গাছের তলায়
এসেছে বেদের দল।
ক্ষণিকের ঘরকন্না দর্শকের হৃদয় ভোলায়।
খড়কুটো জড়ো ক'রে আগুন জ্বালায়
যুবতী বেদিনী,
বাজে রিনিঝিনি
কাচের প্রগল্‌ভ চুড়িগুলি,
বুকের কাঁচুলি
পরিশ্রমে ঈষৎ হাঁপায়,
আচমকা হাওয়া এসে খামোকা কাঁপায়
লাল ঘাঘরা, সবুজ ওড়না।
চৈত্রের রোদ্দুরে যেন বিচিত্রবরনা
রাধিকার ছবি।

আছে সবি।
হাঁড়িকুড়ি চালডাল শালপাতা,
আমি যারে বলি যা-তা
সেই মতো আরো কত
ইতস্তত
রয়েছে ছড়ায়ে।
উলঙ্গ আনন্দে ধুলোমাটিতে গড়ায়
কালোকেলো কয়েকটা শিশু।
বুড়োবুড়ি দুই জোড়া
চুপ ক'রে ব'সে ছাখে জীবনের প্রথম মহড়া
শিশুর চঞ্চল কলোচ্ছ্বাসে।
ঐ দিকে আরো দুটো মেয়ে
গর্বিত আতপ্ত লাস্যে হাস্যালাপে রত,
যুবকেরা আশে-পাশে ঘোরাঘুরি
কতবার ক'রে যায়, দেখেও ছাখে না,
অথচ তাকায় আড়চোখে।
হাওয়া দেয়, উনুন ধোঁওয়ায়,
নিচু হ'য়ে গাল দুটি ফুলিয়ে ফুঁ দেয়
একটি ছোট্ট মেয়ে,
যখন দাঁড়ালো উঠে মুখখানি তার
ছাই লেগে হাঁড়ির তলার মতো কালো,
তাই দেখে উচ্চহাসি হঠাৎ মাখালো
অতর্কিত ফুর্তির রঙে
এ-রাঁধাবাড়ারে,
ধূলিলীন দীনতার সংকীর্ণ ভাঁড়ারে
আকস্মিক আলো ক'রে দিয়ে গেলো।
হাসিগল্প আনন্দের ফাঁকে-ফাঁকে
ঘরকন্না চলে বাঁকে-বাঁকে।

এ যেন বাস্তব নয়, এরা যেন কখনো জানে না
কাজ কাকে বলে।
অফুরন্ত ছুটির রাজত্ব থেকে মুক্ত কোলাহলে
আসে আমাদের দেশে চৈত্রের দুপুরবেলায়,
কিছুক্ষণ মত্ত থাকে রাঁধাবাড়া ঘরকন্না-খেলায়,
তারপর কোথায় মিলায়
নিত্যপরিবর্তনের বিচিত্র লীলায়।
ছাই, ভাঙা হাঁড়ি, আর কিছু খোশা শাকশবজির,
চিহ্নগুলি প'ড়ে থাকে অন্তহীন চড়ুইভাতির।

মনে-মনে বলি, ওরা সুখী নয়,
এ আমারই ভুল।
আমারই রঙিন
কল্পনার ফুল।
ওরা যে দরিদ্র অতি, ওদের কি সুখী হওয়া সাজে?
ওরা যদি সুখী হয়, সে-অন্যায় রূঢ় হ'য়ে বাজে
ইতিহাস-বিধাতার বুকে।
মনে-মনে বলি, আমি ঢের ভালো আছি
নিয়মিত পানাহারে, নিশ্চিন্ত আরামে
শিক্ষিতের শৌখিনতায়।
জীবনের অবরুদ্ধ ক্ষীণতায়
ওরাই কৃপার পাত্র, প্রবৃত্তির আবর্তে ওরাই
বন্দী হ'য়ে আছে ; চিন্তার চড়াই-উৎরাই
ওদের অনধিগম্য, সভ্যতার বিচিত্র রম্যতা
ওরা তার কিছুই জানে না। ওরা একান্তই দেহী।
দেহটা তো চির দাস, মানুষের মন শুধু জানে
দুর্জ্জেয় মুক্তির টানে
আকাশে-আকাশে ব্যাপ্ত হ'তে,
অনির্বচনীয় অন্ধকারে, অনিশ্চিত অপূর্ব আলোতে।

বুদ্ধি বলে বার-বার
সে-মুক্তি আমার।
ওরা বন্দী শরীরসীমায়, আমি মুক্ত মানস জীবনে।
এই তুলনায়
আমারই যে জিৎ
বুদ্ধি বলে বার-বার এতে ভুল নেই।
তবু কেন আমার হৃদয়ে
যেন কোন অতীতের স্মৃতি ব'য়ে
বাজায় মাতাল বাঁশি দক্ষিণের হাওয়া।
রক্তে বাজে গান,
জাগে ঢেউ অশান্ত উচ্ছল ;
সেখানে বেদের দল
অশিক্ষিত কলোচ্ছ্বাসে উচ্চহাসে
তোলে তোলপাড়।
মনে হয়, আমি কবি, আমার আসন
ওদেরই ধুলায় ছিলো, কবে হ'লো নির্বাসন
সে-সহজ, স্বাধীন জীবন থেকে
গম্ভীর, সুস্থির
ধুতি-পাঞ্জাবির
ইস্ত্রি-করা ভদ্রতায়।
আমারে যে পলে-পলে বেঁধে ক্ষুদ্রতায়
আমার স্বজাতি যারা ; কেরানি কি ইস্কুলমাষ্টার হ'য়ে
ছদ্মবেশে চলাফেরা করি, আসলে আমি যেকবি
সেই পরিচয়
প্রাণপণে লুকায়ে-লুকায়ে
জীবনের রসস্রোত ক্রমেই শুকায়।
ঐ যে বেদের দল
ওরি মধ্যে আমার আদিম বাসা।

যারা কবি, যারা গান গায়,
ওরা যে তাদেরে চায়,
তরুণীর তীক্ষ্ণ চোখে আছে পুরস্কার,
শিশুর উদ্দাম নৃত্যে অজস্র উৎসাহ,
আছে নেশা ঘাঘরার রঙে,
আছে খুশি আকাশে-বাতাসে।
ওদের সমাজে
কবিত্ব লজ্জার নয়, ছদ্মবেশ কবিকে হয় না নিতে,
অলজ্জ প্রাচুর্য নিয়ে উন্মুক্ত খুশিতে
একান্তই কবি হ'তে পারে যে সে
এই তো পূর্ণতা তার।
তাই বার-বার
যদিও বোঝায় বুদ্ধি ভালো আছি, খুব ভালো আছি,
তবু এ-হৃদয়
চায় ফিরে যেতে ঐ পথের ধুলায়
প্রথম জন্মের সেই অস্থির কুলায়ে।
কিন্তু এও জানি মনে-মনে
এ কেবল নিষ্ফল আক্ষেপ, অনর্থক বাসনা-বিলাস,
জীবনের সরল উল্লাস
আমার তো নয় আর।
সর্বস্বত্ব তার
ত্যাগ ক'রে এসেছি যে, সভ্যতার কাছে
এই মোর দেনা।
হবে না, হবে না
বেদের মহলে ফিরে যাওয়া।
যে-শৃঙ্খলে আছি বাঁধা ঢুকেছে তা জীবনের মূলে,
ছাড়পত্র হারায়েছি, রাস্তা গেছি ভুলে'।

নির্মম যৌবন

যৌবন করে না ক্ষমা।
প্রতি অঙ্গে অঙ্গীকারে করে মনোরমা
বিশ্বের নারীরে। অপরূপ উপহারে কখন সাজায়
বোঝাও না যায়।
তার সে-পসরা
কিছুতেই যায় না গোপন করা।
বারণ শোনে না,
বিচার করে না কিছু, দূর ক'রে দেয় সব ভেদ,
বিশ্বজয়ী এমন দুর্দান্ত সেনা
এমন নির্মম সাম্যবাদী
আর তো দেখিনে।
আসে পথ চিনে
প্রাসাদে কুটিরে মাঠে পল্লীর নিভৃতে
শহরের কুৎসিত বস্তিতে।
নিশ্চিত সে মৃত্যুর মতোই,
রক্ষা নেই তার হাতে, অমৃতে অথই
হবেই যে-কোনো নারী-দেহ
কোনো-একদিন। দয়া নেই, ক্ষমা নেই ;
জীবনের কিছুকাল—নারী যে, সে রানিও হবেই।
এমনকি পথে-পথে বেড়ায় যে ভিখারিণী মেয়ে
আস্তাকুঁড়ে খাদ্যকণা খেয়ে,
অতি জীর্ণ জঘন্য মলিন যার বাস
তারেও ছাড়ে না
যৌবনের ক্ষমাহীন সেনা।

তারেও সুন্দর করে, তারেও সাজায়,
লজ্জা দেয়, ভঙ্গি দেয়, দেহ ভ'রে তোলে
লাবণ্য-হিল্লোলে।
বোঝে না যে এতই সে নিরুপায়
দেহ যত শুষ্ক হবে, যত মৃতপ্রায়
তত তার লাভ।
এই আবির্ভাবে
শুধু তার বিপদ বাড়াবে।
উচ্ছিষ্টের কণা
কুড়িয়ে পাওয়ায় যার জীবনসাধনা
তারে কি মানায়
যৌবনের উন্মীলন কানায়-কানায়।
চায়নি সে, চায়নি সে, নিতান্তই ক্ষুন্নিবৃত্তি যার
সব চেয়ে বড়ো কাম্য, এ যে তার অসহ্য জঞ্জাল,
উপরন্তু বিড়ম্বনা।
দেহে যার আবরণ নেই, শয্যা যার পথের ঘৃণিত আবর্জনা
তার 'পরে এ কী অত্যাচার!
পশুতে পাখিতে গাছে ঘাসে
আনন্দিত পূর্ণতায় যৌবন বিকাশে,
হিরণ্ময় পাত্রে ঝরে সুবর্ণ মদিরা।
ওরাও যে সুন্দর আধার
তাই তো ওদের আছে জন্ম-অধিকার
যৌবনের জাদুকর রূপান্তরে।
বিশ্ব ভ'রে চেয়ে দেখি সুন্দরের লীলা
এর মধ্যে ক্লেদাক্ত মাটির ভাঁড়
বিশ্বের কুৎসিত ক্ষত ঐ ভিখারিণী।
যার কিছু নেই, তার যৌবনেও নেই অধিকার
অতি সত্য এই কথা,

তবু প্রতিদিন এর ঘটায় অন্যথা
নির্মম নিয়তি।
ভিখারিণী, সেও যে যুবতী
এ বেসুর, এ নিষ্ঠুর অসঙ্গতি
কেমনে সহিছে বিশ্বপ্রকৃতির বীণা
আমি তো বুঝি না।

বিচিত্রিত মুহূর্ত

জীবনানন্দ দাশ

কবিকরকমলে

সে-পথ নির্জন
যে-পথে তোমার যাত্রা।
সে-পথে আসে না অশ্বারোহী,
পদাতিক বীর সৈন্যদল।
অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা নেই, যান-যন্ত্র-মুখরিত নাগরিক জনতার স্রোত নেই,
নেই যোদ্ধা, নেই জয়ী, নেই পরাজিত।

সে-পথ সন্ধ্যার।
শুধু সমুদ্রের স্বর, অন্য-কোনো শব্দ নেই।
শুধু সমুদ্রের স্রোত, অন্য-কোনো গতি নেই।
একটি জ্বলন্ত তারা
আকাশের জ্বলন্ত হৃৎপিণ্ড যেন,
এঁকে যায় সেই পথ স্বচ্ছ নীল ঝলকে-ঝলকে
সমুদ্রের মানচিত্র-নীলে।

ছন্দ

রাত্রি নিদ্রাতুর।
বৃষ্টির ঝর্ঝর সুর ঝরিছে মধুর
স্বপ্নের অস্পষ্ট মহাদেশে।
যেন দীর্ঘ যাত্রাশেষে
সুদূর সমুদ্রভালে দীর্ঘ নীল টিকা
জ্বলে আমেরিকা।
মানচিত্রহীন পথে ইচ্ছার অবাধ অভিযানে
চলেছি বৃষ্টির যানে
কোথায় জানি না।

বাজে বীণা
সুরে তালে লয়ে।
আমার হৃদয়ে
ছন্দ কবে বেঁধেছিলো বাসা,
আজ তারই ভাষা
উথলে বৃষ্টির সুরে, মোহিনী রাত্রির
ঘুমে ভরা চুম্বনে ছিনায়ে নেয়, কী অস্থির
ব্যথার উল্লাস তোলে বুকে।
জীবনের সব দুঃখসুখে
তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়।
আমার হৃদয়
সে কি শুধু ছন্দের নৃত্যের
বিচিত্রিত মুহূর্তের
মৃন্ময় আধার?

ধ্বনির অবোধ রঙ্গে, সুরের তরঙ্গে
কেবলি কি ভেসে যাবে গ্রহসূর্যতারাদের সঙ্গে
হৃদয় আমার ?
হৃদয়ে আমার
কার, কার পদধ্বনি, প্রতিধ্বনি ? কে তুমি, কে তুমি—
অচেতন মনোবনভূমি
উচ্ছ্বসি' শুধায়।
তোমাকে কি কোনোদিন দিয়েছি বিদায় ?
কখনো অবহেলায়
আমি যদি ভুলে' থাকি তুমি তো ভোলোনি।
আমার বিশ্বের জন্ম তোমার লীলায়,
তোমারই চকিত স্পর্শে কেঁপে ওঠে কল্পনার শ্রোণী,
কবিতার জন্ম হয়।
আমার হৃদয়
পূর্ণ ক'রে তুমি আজ এলে
বৃষ্টি-ঝরা রাত্রিতে পা ফেলে
ঝঙ্কারে, নিক্কণে,
অচেতন মনোবনে পতঙ্গগুঞ্জনে,
পাখির অশান্ত কাকলিতে,
সব-শেষে ভাষাতীত বিশাল নিভৃতে—
যে-শূন্যে কিছুই নেই, শুধু এই নৃত্যবেগে উন্মত্ত সৃষ্টির
স্তব্ধ কেন্দ্রে তুমি আছো স্থির।

এখন বিকেল

এখন বিকেল।
চলো যাই, যেইখানে নারিকেল
শুপারির পাতায়-পাতায়
দখিনা হাওয়ার ঢেউ দোলে।
চলো বাইরে যাই।
চলো যাই রাস্তা পার হ'য়ে
ট্র্যাম-লাইন পার হ'য়ে—ঝাঁকে-ঝাঁকে দেয়ালে-দেয়ালে
শকুনের দুরন্ত ডানার মতো প্ল্যাকার্ডের দল
ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ন্ত শকুন প্ল্যাকার্ডের দল
ছিঁড়ে কেড়ে নিতে চায়, কেড়ে নিয়ে খেতে চায় চোখ—
আমরা এড়ায়ে যাবো। যাবো যেইখানে
শুপারির সরু-সরু ছায়া চলে
চঞ্চল সাপের মতো এঁকে-বেঁকে
দক্ষিণের হাওয়ার তাড়ায়।
আমাদের এ-পাড়ায়
শান্তি নেই, চারদিকে গ্রামোফোন। আমাদের এই ঘরে
আলো নেই, চলো বাইরে যাই।
কড়া ইলেকট্রিক আলো কাঁচা চর্বির মতো শাদা
এখনি জ্বালতে হবে। চায়ের চামচে
বাজবে তোমার
হাতের চুড়ির তালে-তালে। পাশের ফ্ল্যাটের
উনুনের ধোঁয়া এসে নিমেষে নিঃশ্বাস
কেড়ে নেবে—অতি-উন্নাসিক সমালোচনার মতো।
তবু—তবু এখনো বিকেল
বাইরে বিকেল।

এখনো বিকেল আসে চুপে-চুপে কলকাতায়
এখনো কোকিল ডাকে হঠাৎ-ব্যথার মতো
দক্ষিণে হাওয়ায়।
আমরা আজ দুঃসাহসী সমুদ্র-দস্যুর মতো
চলো লুঠ ক'রে আনি বিকেলের রূপকথা-দ্বীপেরে।
কী সুন্দর তুমি! তোমার শরীর যেন পাল-তোলা
নৌকার মাস্তুল
ছল্‌ছল্‌ জলের ঢেউয়ের মতো চুল।
চলো, চলো! রুপালি শাড়ির
আঁচল উড়িয়ে দাও দক্ষিণে হাওয়ায়
দিগন্ত-তৃষ্ণায়
ফুলে-ওঠা উৎসুক পালের মতো।
চলো যাই, যেইখানে নারিকেল
শুপারির জড়িত ডালের
ছায়ার জালের
ফাঁকে-ফাঁকে আলোর সোনালি গুঁড়ো
সোনালি বৃষ্টির মতো ঝরে
মাঠের উপরে।
হঠাৎ-ব্যথার মতো যেখানে কোকিল
চুপচাপ আকাশেরে ছিঁড়ে দিয়ে যায়
দক্ষিণে হাওয়ায়।
সেখানে সোনালি আলো সোনালি বৃষ্টির মতো ঝরে
মুখের উপরে। উজ্জ্বল জলের মতো ঝরে
তোমার আমার মন; উচ্ছল স্রোতের মতো পরস্পরে
ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ঝলকে-ঝলকে মিশে যায়
তোমার আমার মন।
এইখানে আঁকাবাঁকা ছায়ার বুনোন
ভ'রে দিলো মন।

চেয়ে দ্যাখো, স্মৃতির জানালা খোলা।
চেয়ে দ্যাখো, কত মেঘ রঙিন মোমের মতো
জ্বলে গেলো, গ'লে গেলো পশ্চিমের লালে।
দিগন্তের আম-জাম-নিম
যেখানে নিবিড় নীল, সেখানে পশ্চিম
লাল হ'লো
লাল মশালের মতো।
লাল মশালের মতো উদ্দাম রঙিন
জ্বলন্ত পশ্চিম।
চেয়ে দ্যাখো, দিগন্তের নিবিড় স্থবির নীল
হঠাৎ জঙ্গম হ'লো রঙ্গিল ছায়ায়।
ঝলোমলো ঝলোমলো
পশ্চিম চঞ্চল হ'লো,
হৃদয় চঞ্চল হ'লো
তোমার আমার।
চেয়ে দ্যাখো, হলদে পাতার দল ঘুরে-ঘুরে
কানে-কানে এলোমেলো কথা কয় :
এলোমেলো এলোমেলো
হৃদয়ে বসন্ত এলো
তোমার আমার।
এখন বিকেল, চলো যাই
চলো যেইখানে নারিকেল
শুপারির পাতায়-পাতায়
দক্ষিণে হাওয়ার দোলা।
চলো যাই। আর
আর-একটু কাছে এসো, হাত রাখো হাতে।

কানে-কানে কথা কই হলদে পাতার মতো
হলদে পাতার মতো ঘুরে-ঘুরে দক্ষিণে হাওয়ায়।
হয়-তো উঠবে চাঁদ
উঠবে হলদে চাঁদ
মাথার উপরে
আর-একটু পরে।
হলদে পাতার মতো একমুঠো চাঁদ
হালকা পরির মতো উড়ে চ'লে যায়
দক্ষিণে হাওয়ায়।
হয়-তো উঠবে চাঁদ
হয়-তো উঠবে চাঁদ মাথার উপরে
হয়-তো ফুটবে চাঁদ বুকের ভিতরে
তোমার আমার।
এসো, আর-একটু কাছে এসো, আর
রক্তের নদীতে শোনো চাঁদের জোয়ার।
আঁটোসাঁটো ছোটো ফ্ল্যাটে আমাদের বাসা,
ঘরে ব'সে পাশের বাড়ির গ্রামোফোন ;
ঝাঁকে-ঝাঁকে প্ল্যাকার্ডের শকুনের পাখা
আমাদের দিনের মুখেরে ঢেকে দেয়।
আমাদের দিনগুলো গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে ভেঙে যায়
ট্র্যাফিকের চাকায়-চাকায়।
তবু—তবু এখন বিকেল।
এখনো বিকেল আসে চুপি-চুপি কলকাতায়
হঠাৎ-ব্যথার মতো এখনো কোকিল ডাকে
দক্ষিণে হাওয়ায়।
এখনো এ-কলকাতার আকাশের সিঁড়ি ভেঙে
চুপি-চুপি উঠে আসে চাঁদ।
এখনো রক্তের স্রোতে চাঁদের জোয়ার।

এখন বিকেল,
ঝলোমলো জ্বলন্ত পশ্চিম,
চলো, চলো।
এলোমেলো দক্ষিণে হাওয়ায়
স্মৃতির জানালা খোলা ; চলো,
চলো।

কার্তিক

ঘুমে ভরা, বিষণ্ন নিঃশ্বাসে ভরা নীরক্ত কার্তিক।
নিশ্চল নিষ্প্রভ দিন, আকাশ পাণ্ডুর।
স্তম্ভিত নিঃস্রোত বেলা, পৃথিবীতে পীত পাণ্ডুরোগ।
নিশ্চিত মৃত্যুর মতো
আসন্ন শীতের বেলা
হামাগুড়ি দিয়ে চ'লে আসে ;
শূন্যদিনে শূন্যমনে শুয়ে-শুয়ে
শহরের বিমর্ষ গোঙানি শুনি,
কাক আর কুকুরের ডাক ;
শহরের মুমূর্ষু নিঃশ্বাস শুনি।
কিরাত-কার্তিকে কাক ডেকে-ডেকে
গৃহস্থের ঘরে-ঘরে নিয়ে এলো।
বিবর্ণ আকাশে
ওৎ পেতে চুপ ক'রে থাকে
সারাদিন ধূসর শ্বাপদ এক ;
সারারাত্রি ধূসর শ্বাপদ এক
হা-হা ক'রে চ'ষে-চ'রে ফেরে
আকাশের অনাকার অন্ধকারে

জলাপাহাড়ে কুয়াশা

কুয়াশায় লুপ্ত চরাচর।
প্রভাতমধ্যাহ্নহীন দিন।
আলো-ছায়া, মেঘ-মেলা, সবুজ-নীলের ইন্দ্রজাল
অঙ্গীভূত, একীভূত।
পাহাড়, আকাশ, শতরূপী বন্ধুরশরীর
পৃথিবীর প্রদর্শনী,
উদ্ধত তুষারশ্রেণী, কিছু আজ নেই।
সূর্যের উজ্জ্বল সেতু চুরমার। আলোর প্রাকার ছারখার। আজ
আলো নেই, অন্ধকার নেই।
জড়বুদ্ধি মুমূর্ষুর মস্তিষ্কের মতো
অস্পষ্ট আচ্ছন্ন দিন
অপরাহ্নসন্ধ্যাহীন
স্তম্ভিত মন্থর।
নৈর্ব্যক্তিক একত্রিক ধূসর মুহূর্তদল
পরস্পরে মেশা। পৃথিবীর জটিল জ্যামিতি
রেখা কোণ বাঁক বৃত্ত, চঞ্চল স্থাপত্যলীলা,
রঙের অসংখ্য সূক্ষ্ম শ্রুতি, নৃত্যশীল ছায়া, প্রতিচ্ছায়া
নিঃসংজ্ঞ, নির্বেদ। নিসর্গ নিশ্চিহ্ন আজ,
অভিন্ন অরণ্য মেঘ উচ্চচূড়া নিম্নভূমি,
যেন কোন প্রাক্-ইতিহাস
বিবর্তন-অতিক্রমকারী
জন্তুর চতুর বংশধর
সৃষ্টিরে আচ্ছন্ন ক'রে

মুছে নিলো রূপ, সজ্জা, ভঙ্গি, ভান, পরিবর্তনের
বিচিত্রতা, এলো কালরাহুরূপে
করাল বিশাল গ্রাসে
বিশ্বব্যাপী সমীকরণের
নিরন্তর ধূসরতা।

জীবলোক যেন প্রেতচ্ছায়া
পথচলা যেন মহাশূন্য ভেদ ক'রে।
সৃষ্টির অতীত কালে
পৃথিবীর এই রূপ ছিলো বুঝি
অনির্ণীত, অস্পষ্ট, চঞ্চল,
ধূমল মণ্ডল।
শূন্য, শূন্য, শূন্যময় বিশ্বের প্রসারে
প্রতীক্ষায় পৃথিবীর ভ্রূণ
কত যুগ-যুগান্তর।
আজ এই কুয়াশায় শূন্য, শূন্য, শূন্যময় বিশ্বে কিছু সত্য নেই
শুধু আমাদের এই ছোটো ঘরে
অগ্নিকুণ্ড ঘিরে
হিম হাত উষ্ণ করা;
শীতের বিশীর্ণ জরা
ব্যর্থ ক'রে, ছোটো-ছোটো হাসি, গল্প, বই পড়া;
শুধু আগুনের লাল ছায়া
তোমার পাণ্ডুর গালে, আর শুধু তোমার চোখের
অন্তহীন মায়া।

ম্যাল্-এ

১

'আপনারা কবে?   আমরা এসেছি সাতাশে।
ওকভিলে আছি।   আসবেন একদিন।'—
শাড়ির বাঁধনে শোভে শরীরের ইশারা,
ঠোঁটের গালের রঙের চমকে কী সাড়া।
কী করুণ, আহা, অতরুণ তনু সাজানো।
সবি বুঝলুম।   ইচ্ছে হ'লে যে বাংলাও পারে বলতে
তাও বুঝলুম।   মহৎ যত্নে অ্যাকসেণ্টগুলো মাজানো
ব্যর্থ হবে কি তাই ব'লে, বলো।
নিখুঁত বাংলা ফোটে ফিরঙ্গ রঙ্গে,
ইংরেজি সুরে তির্যক গতি-ভঙ্গে।
আমরা চমকে থমকে দাঁড়াই, হয়তো বা কারো জুতোই মাড়াই,
বাংলা শুনেই সার্থক শ্রম চৌরাস্তায় সন্ধেবেলায় হাঁটলে।
ভাবি শুধু এই, অমনি সুরেই বেরোবে কি বুলি হঠাৎ চিমটি কাটলে?

২

আজকে না-হয় ম্যালেই চলো।
ভারি সুন্দর বিকেল—না?
মিমির জন্যে কী-খেলনা
কিনবে?   দোকানে গেলেই হ'লো।
তোমার নতুন কী চাই, বলো?
কিচ্ছু চাইনে?   এমন মিথ্যে
কী ক'রে বললে?   কপট অঙ্ক
রটায় আমার কত কলঙ্ক,
তুমিও কি তাই শুনে ঘাবড়ালে?

গণিকা গণিত লক্ষপতিকে
খোশামোদ করে, পেয়ে বেগতিকে
আমাকে নিত্য করে নাজেহাল ;
কখনো একটু পিঠ চাপড়ালে
খুশি হয় মন, পানি পায় হাল—
এ ছাড়া আমার, বিশ্বাস করো, আর কোনো দোষ নেই চরিত্রে।

৩

আজো কি মানবে গণিতের কড়া জুলুম
জাদুকর রোদে এমন বিরল বিকেলবেলায় ?
হীন অঙ্কের মেনে দাসত্ব
হারাবো কি শেষে জীবনস্বত্ব ?
বেঁচে থাকবার এই কি সর্ত ?   তুমিই বলো !
সিঁদুরে শাড়িটা প'রে নাও তাড়াতাড়ি। ম্যালেই চলো।
মলিন হিসেব ঋণের কুঁজও আজকে মিলায়
তুষার-তাঁবুর দড়ি-ছেঁড়া তিব্বতি এ-হাওয়ায়,
ভোলো প্রতিদিন-পুঞ্জিত ঋণ, ভোলো বেমালুম
জোড়াতালি-দেয়া ছেঁড়াখোঁড়া দিন।   কপাল ভালো,
খালি প'ড়ে আছে আস্ত বেঞ্চি।
ভোলো, ভয় ভোলো।
যে-ভয় জীবনে ফণিমনসার বন,
যে-ভয়ে নিত্য মেনে চলি মহাজন,
যে-ভয়ে কখনো গান্ধির কভু অরবিন্দের চরণ-শরণ,
ত্যাগের কন্থা যোগের পন্থা মানস-বরণ,
দিশি সিনেমায় ঋষি-মহিমায় ইচ্ছাপূরণ,
সত্য, শিব ও সুন্দরে ঢাকি জীর্ণ জীবন, জীবনে-মরণ,
যে-ভয়ে নিত্য ব্যর্থ কর্ম, মিথ্যাচরণ,
কেননা জীবন কেবলি জীবনধারণ,
জীবিকাই, হায়, জীবন।   আজ
সে-ভয় ভোলো।

ছাখো চেয়ে ছাখো পায়ের তলায় মেঘের মেলায় আলো মিলায়,
উত্তর-জোড়া তুষার-চূড়ায় খেয়ালি বিকেল আগুন ছড়ায়,
ক্ষণিক রঙের বণিক সূর্য নিবলো এবার। হারালো তুষার-মোড়া উত্তর,
হারালো আকাশ হঠাৎ কুয়াশা লেগে, বারুদগন্ধি মেঘে।
ছায়ামুড়ি দিয়ে ছায়ামূর্তির মতো
জটিল জনতা প্রগল্‌ভ গতিশীল,
স্বৈরী মেঘের পূর্ণ স্বরাজ
দেখেই কি ওরা এমন দরাজ,
স্বেচ্ছাচারের উচ্চচূড়ার জঙ্গমতা
বঙ্গমাতার সন্তানেরাও আজ কি পেলো ?
মেঘ-মুড়ি দিয়ে জ্বললো আলো,
ল্যামপোস্টগুলো পরেছে আলোর গোল টুপি,
ঠিক খৃষ্টান দেবদূত!
এসো কাছে এসো, শোনো কথা চুপি-চুপি,
এ কি নয় অদ্ভুত
তুমি আর আমি ব'সে আছি এই কুয়াশা-মোড়া
চৌরাস্তায়, মেঘের মধ্যে,
সব বেয়াদব চোখ মুছে গেছে এ-ঘন মেঘে,
এবার বলো!
এখনি হয়তো হঠাৎ হাওয়ার আঘাত লেগে
মেঘ কেটে যাবে ; কেটে যাবে এই গণিত-অতীত বিরল ক্ষণ।
এখনি বলো। ঐ তো এলো
নিষ্ঠুর হাওয়া মেঘের ঝাঁটা, কুয়াশা-কাটা!
আকাশ ফেটে কি ফুটলো তারা ? লাগলো হাওয়ার তীব্র তাড়া ?
এবার তাহ'লে ফিরেই চলো। আজো কি হ'লো
তোমার আমার অনেকদিনের অঙ্গীকারের উদ্‌যাপন ?

সাগর-দোলা

ছোটো ঘরখানি মনে কি পড়ে,
সুরঙ্গমা ?
মনে কি পড়ে ? মনে কি পড়ে ?
জানালায় নীল আকাশ ঝরে
সারাদিনরাত হাওয়ার ঝড়ে
সাগর-দোলা,
সারাদিনরাত ঢেউয়ের তোড়ে
নাগর-দোলা,
আকাশ-মাতাল জানালা খোলা
দিগন্ত থেকে দিগন্তরে,
দিগন্ত-জোড়া সাগর ভ'রে
ঢেউয়ের দোলা।
সারাদিনরাত হাজার ঢেউয়ের উচ্চস্বরে
অন্ধ অবোধ হাওয়ার ঝড়ে
কী যে লুটোপুটি ছুটোছুটি ঐ ছোট্ট ঘরে
মনে কি পড়ে ? মনে কি পড়ে ?
কত কালো রাতে করাতের মতো চিরে
ভাঙাচোরা চাঁদ এসেছে ফিরে
তীক্ষ্ণ তারার নিবিড় ভিড়ে
ভাঙন এনে,
কত কৃশ রাতে চুপে-চুপে চাঁদ এসেছে ফিরে
সাগরের বুকে জোয়ার হেনে
তোমারে আমারে অন্ধ অতল জোয়ারে টেনে
মনে কি পড়ে ?
কত উদ্ধত সূর্যের বাণে তুমি আর আমি গিয়েছি ছিঁড়ে
কত যে দিনেরে চুম্বন টেনে দিয়েছি মুছে

কত যে আলোর শিশুরে মেরেছি হেসে
সেই ছোটো ঘরে মনে কি পড়ে
সুরঙ্গমা,
মনে কি পড়ে ?
জানালায় নীল আকাশ ঝরে
সারাদিনরাত ঢেউয়ের দোলা,
সমুদ্র-জোড়া দিগন্ত থেকে দিগন্তরে
সারাদিনরাত জানালা খোলা।
দস্যু হাওয়ার উচ্চস্বরে
তপ্ত ঢেউয়ের মত্ত জোয়ার-জ্বরে
কী যে তোলপাড় দাপাদাপি ঐ ছোট্ট ঘরে মনে কি পড়ে
সুরঙ্গমা ?
মনে কি পড়ে
তোমার আমার রক্তে ঢেউয়ের দোলা,
মনে কি পড়ে
তোমার আমার রক্তে হাজার ঝড়ে
কত সমুদ্র তপ্ত জোয়ার-জ্বরে
মনে কি পড়ে ?
কত মৃত চাঁদে এনেছি ফিরায়ে রাত্রিশেষে
কত বর্বর শিশু-সূর্যেরে মেরেছি হেসে
ঘন-চুম্বন-বন্যায় কোন অন্ধ অতলে গিয়েছি ভেসে
মনে কি পড়ে
সুরঙ্গমা,
মনে কি পড়ে ?

পদ্মা

দিন কাটলো ইষ্টিমারে।
ঝেঁকে-ঝেঁকে বিষ্টি পড়ে,
হঠাৎ থামে। মেঘ-ভাঙা রোদ ঝলক তোলে তীব্র জলে।
আবার নামে
কালো মেঘের পুঞ্জ জমে,
আকাশে কে থেকে-থেকে গড়ে পাহাড়, রাজার বাড়ি, উঁচু মিনার,
ছায়া ছড়ায় কালো হাওয়ায়, ইষ্টিমারের চাকার তলায় শাদা ফেনার
ঢেউয়ের সারি কালো নদীর হৃদয় চেরে, ঘুরে ফিরে ঘূর্ণি তোলে ;
একটু পরেই ভাঙে আবার ভাঙে পাহাড় রাজার বাড়ি, যায় মিলিয়ে
উঁচু মিনার ; খামখেয়ালি কোন খেলা এ !
আধেক নদী কালো ছায়ায়, আধেক ঝলে আলোয়,
ক্ষণেক দেখি মস্ত নদী রুপোর মতো জ্বলে
নীল আকাশের তলায় ;
সূর্য ভাঙে লক্ষ কণায় ঢেউয়ের কোণায় চোখ-ধাঁধাঁনো ঝিকমিকিতে,
আকাশ ঝরে আলোর তোড়ে ; ক্ষণেক পরে
মেঘের পাখার ঝাপটানিতে দূরের গ্রামে ছায়া নামে,
ঢেউয়ের শ্রেণী কালো বেণীর মতো জড়ায়, কেঁপে-কেঁপে তীরে গড়ায়,
দিগন্তকে ঝাপসা ক'রে ঝেঁকে-ঝেঁকে বৃষ্টি ঝরে।—
আলো-ছায়ার অফুরন্ত খামখেয়ালি খেলা
দেখে-দেখে কাটলো দুপুরবেলা
ইষ্টিমারে।

মিলিয়ে গেলো নারানগঞ্জের লাল টিনের ছাদ,
পোষা হাতির পালের মতো গাধাবোটের দল,
ক্ষীণতনু তরুণীদের মতো চপল
ছোট্ট ফেরিগুলির চলাফেরা
আর যায় না দেখা। রইলো শুধু জল।

তিনদিকে জল ঢলোঢলো, দিগন্তে নীল জল,
বাঁকা রেখায় দূরে মিলায় ঘন শ্যামল তীর,
কখনো নীল আর কখনো রুপোর মতো শাদা
কখনো বা নরম কাদার চোখ-জুড়োনো রং ;
বাদামি জল বেগুনি জল ধূ-ধূ ধূসর জল,
ঢেউয়ের দোলায় রঙের লীলায় আকাশ-তলে
আরেক আকাশ ছুটে চলে।
এই আষাঢ়ের উদ্দামতায় উদ্ধত উচ্ছল
বাংলাদেশের হৃদয়জোড়া পদ্মানদীর জল।

মস্ত বড়ো নদী পদ্মা, যেন সমুদ্দুর।
দুই হাতে সে জড়িয়ে আছে ঢাকা ফরিদপুর।
মেঘলা রঙের মেঘনা হ'য়ে মেশে সমুদ্দুরে।

হারিয়ে গেলো নীল দিগন্ত, সামনে এলো তীর
সবুজ গাছে ধানের খেতে আঁকা।
আধেক চাঁদের মতো বাঁকা ছিপছিপে ঐ খাল
পাঁচটি গ্রামের কোলে
পড়ছে ঢ'লে খলখলিয়ে হেসে,
যেন নদীর ভরা বুকের ভালোবাসার বান
আপন টানেই উপচে পড়ে, ছড়িয়ে দেয় প্রাণ
ক্ষণে-ক্ষণে বাংলাদেশের কোণে-কোণে।
খালের পাড়ের ইষ্টিশানের আটটি টিনের ঘর,
বিকেলবেলার বাঁকা আলোয় তাও হ'লো সুন্দর,
ইষ্টিমারের একদিকে তীর, অন্যদিকে চর।

আধেক জাগা আধেক ডোবা বর্ষানদীর চর
কৃষ্ণ রাতের চাঁদের একটু ফালি,
তারি মধ্যে লম্বা ধানে ঘেরা
দুটি চারটি ছোট্ট টিনের ঘর।

চরের পরে মস্ত নদী দেখা যায় না কূল,
মেঘের রঙে মাটির রঙে এমন ঢলাঢলি।
ধূ-ধূ ধূসর জলে জড়ায় লাল মাটির রং
তীব্র স্রোত দিগন্তে টল্‌মল্‌।

সত্যি কী সুন্দর
বিকেলবেলায় পদ্মানদীর চর।
ইলা বললে এই আমাদের মনের মতো ঘর।
আকাশ ভরা ভালোবাসার চির-চপল ভঙ্গি,
যেদিকে চাই পদ্মানদী দিনরাত্রির সঙ্গী।
ঠাণ্ডা হাওয়া, টাট্‌কা ইলিশ, নরম ঠাণ্ডা মাটি,
একমাত্র অসুবিধে নেই ইলেক্‌ট্রিসিটি।

সত্যি বড়ো ভালো লাগে ইষ্টিমারে আরাম ক'রে ব'সে
কাল সকালেই কলকাতাতে পৌঁছবো তায় সন্দেহ নেই জেনে
চেয়ে-চেয়ে দেখতে চরের নির্জনতা, শ্যামলতা,
এই আষাঢ়ের পদ্মানদীর উচ্ছলতা,
মনে-মনে ভাবতে, আহা এখানে কি থাকা যায় না এসে!
আকাশ ভরা এমন আলো, এমন স্বাধীন সুস্থ হাওয়া, স্নিগ্ধ নরম মাটি,
তিনদিকে দিগন্ত ছুঁয়ে পদ্মানদীর জল
ঢলোঢলো লাবণ্যে উচ্ছল;
অন্যদিকে শ্যামল ধানের গ্রাম,
আধেক চাঁদের মতো বাঁকা খালের পাড়ে ছোট্ট ইষ্টিশান।
সাজসজ্জা চক্ষুলজ্জা চুলোয় দেবো
যত ইচ্ছে দুধে মাছে মোটা হবো,
এমন স্বর্গ ছেড়ে কোথায় যাবো? কলকাতায় কী আছে!

ইতিমধ্যে ঘুরলো আবার ইষ্টিমারের চাকা,
কাব্যি অনেক হ'লো, এবার চা।

আমরা যখন নানারকম খাবার খাচ্ছি, চুমুক দিচ্ছি চায়ে
হঠাৎ দেখি চেয়ে
একেবারে কিনার ঘেঁষে যাচ্ছে ইষ্টিমার ;
প্রচণ্ড তোলপাড়
লাগছে জলে ; কৌতূহলী বৌ-ঝির দল ঘরকন্না ফেলে
দেখছে ইষ্টিমারের কাণ্ড ; হয়তো ভাবছে এই বর্ষায় বাড়িখানা টিঁকলে বাঁচি।
কত মাটি গিললো পদ্মা, ভাঙলো কত হাজার বাড়ি, তলিয়ে গেলো কত রাজার বাড়ি,
রাক্ষসীটার শান্তি তবু নেই !
ইষ্টিমারের ধাক্কা লেগে শোঁ-শোঁ শব্দে মস্ত-মস্ত ঢেউয়ের পরে ঢেউ
লাগছে পাড়ে, ভাঙছে শাদা ফেনায়।
ইলা বললে, মনে পড়ছে পুরী,
এমনি ঢেউয়ে লুটোপুটি দাপাদাপি মনে কি নেই ?
ছাখো, ছাখো, কালোকোলো নেংটি-আঁটা ছোট্ট ছেলেগুলো
দাঁড়িয়ে আছে নির্ভাবনায় পা ডুবিয়ে জলে,
এক্ষুনি ঢেউ এলো ব'লে, ঐ যে আসে,
দৌড় দিয়েছে ঢেউয়ের সারি উর্দ্ধশ্বাসে
কারে ওরা করছে তাড়া ? টলমলালো উপুড়-করা ডিঙিগুলো,
টানো টানো, ডাঙায় তোলো—ঐ যে এলো
শোঁ-শোঁ শব্দে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো
ছ'টা ছোট্ট কালো মাথা—বাস্‌রে, ওদের সাহসটা কী !
এমন ঢেউয়েও হাত-পা ছুঁড়ে দাপাদাপি,
পদ্মা নিয়েই বুঝি ওদের খেলা !
ঢেউয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে জলের গলা,
এক দুরন্তে ছ'টি ছোট্ট দুরন্ত দেয় ডুব—
কোথায় গেলো ?—আরে ঐ তো খানিক দূরে ডাঙায় উঠে

ইষ্টিমারকে লক্ষ্য ক'রে চ্যাঁচাচ্ছে জোর গলায়,
জ্ব'লে উঠছে পিছল আলো জলে-ভেজা চিকচিকে গা-গুলোয়—
আরে আরে কী সর্বনাশ। ঐ যে ভেসে যাচ্ছে একটা ছেলে
ঢেউয়ের মুখে কুটোর মতো ছুটে।
ঐ ডুবলো, ফের উঠলো—আর-একটা ঢেউ বাঘের মতো লাফিয়ে প'ড়ে
কোথায় নিয়ে গেলো ওকে? হায় হায় ও তলিয়ে গেলো,
হাঁ ক'রে সব মানুষগুলো দাঁড়িয়ে আছে ডাঙায়,
এতগুলো চোখের সামনে ছেলেটা কি ডুবে মরবে—আহা!
কোথায় সারেঙ ডাকো তাকে থামাক ইষ্টিমার!
কী আশ্চর্য কারো কোনো সাড়াশব্দই নেই!
তুমিও বেশ—খাচ্ছো চীনেবাদাম ভাজা!
এ কী কাণ্ড! ঐ তো দেখি ভেসে উঠলো
হাঁড়ির তলার মতো কালো ছোট্ট মাথা,
হাত বাড়িয়ে ধ'রে ফেললো পাটের গোড়া,
হেঁচড়ে টেনে প'ড়ে রইলো পাটখেতের কাদায়
একটু পরেই লাফিয়ে উঠে বাড়ির দিকে দৌড়—
সাবাস ছেলে!

দেখতে-দেখতে কূল হারালো ইষ্টিমারের ঘূর্ণি,
আদিগন্ত ছুটে চলে খোলা জলের শূন্যি।
টিনের বাড়ি গাছের সারি কৌতূহলী বৌ-ঝির ভিড় হারিয়ে গেলো;
সূর্য-ডোবার আবির রঙে হালকা ডিঙি নৌকোগুলো
গাল-ফোলা লাল-কমলা পালের ক্ষণ-লীলায়
মাতলো সন্ধেবেলায়।
বাইরে চেয়ার টেনে আমরা ব'সে
দুটি একটি কথা বলছি মৃদুস্বরে,

এমন সময় সোনা-জ্বলা নদীর জলে
সূর্য ডোবালো তার টকটকে লাল গলা।
লাগলো আগুন আকাশ জুড়ে মেঘে-মেঘে
পশ্চিমে ছড়িয়ে দিলো বিয়ের রাতের রং
মেঘের উপর মেঘ চড়লো, হলদে হোলি গোলাপি বেগনি—
আহা আহা কী সুন্দর, কতদিন যে এমন দেখিনি।

মস্ত বড়ো নদী পদ্মা বিচিত্রবরন,
দিনরাত্রির আলোছায়ায় ছড়ায় রংবেরং,
প্রাণ বিলোয় বাংলাদেশের বাহান্ন পরগনায়।

তারপরে রাত নামলো।
আকাশ-তলে নদীর জলে ছায়ার কোলাকুলি।
ঢেউ উঠলো, হাওয়া ছুটলো, ফুটলো তারার গন্ধহারা কুন্দ,
আরো ঘণ্টা তিনেক পরে আসবে গোয়ালন্দ।
হারিয়ে গেছে অন্ধকারে গাছপালার নীল কিনার
মিলিয়ে গেছে মেঘের সিঁড়ি রাজার বাড়ি উঁচু মিনার,
কালো জলের কলকলানি শুনতে-শুনতে ঘুম পেয়ে যায়।
এখন ডিনার।

রাত বাড়লো।
মস্ত রাতের হৃদয় চিরে কালো পদ্মা ছুটে চলে
সার্চলাইটের তীব্র তীরে বেঁধা।
ঢেউ তুলছে, ফেনা ফুলছে, এ-কূল ও-কূল কালোয় হারা
দিগন্তহীন অন্ধকারের ঘোমটা-পরা মস্ত রাতে
বাইরে রেখেছে ঠেলে ছোট্ট কেবিন ইলেকট্রিকের আলো জ্বেলে।
ঝক্‌ঝক্‌ঝক্ কাঁপছে কেবল ইষ্টিমারের ছন্দ,
আর তো সময় কাটে না, কখন গোয়ালন্দ!

দুপুরবেলা বিদায়

নারানগঞ্জের ইষ্টিশানে দুপুরবেলায়
কতবার যে যাওয়া-আসার পালা।
রেলগাড়ির ঘণ্টা বাজে, ইষ্টিমারের শিঙা,
নদীর জলে রোদের ঝিলিমিলি।
দমকা হাওয়ায় ধুলো ওড়ে, ফোলে নৌকোর পাল,
দোলে নৌকো ইষ্টিমারের ঢেউয়ে,
বরফওলার হাঁকের সঙ্গে কুলির কিচিরমিচির
বাঙাল ভাষার জাঙাল ছেঁকে ধরে।

নারানগঞ্জের ইষ্টিমারে দুপুরবেলায়
তোমার মুখটি হারিয়ে গেলো দূরে,
চোখের জলে ঝাপসা হ'লো কমলারঙের শাড়ি,
এগিয়ে এলো পাটগুদোমের লাল টিনের ছাদ।
ইষ্টিমারের এঞ্জিনটার ধ্বকধ্বকধ্বক ছন্দে
কেঁপে উঠলো আকাশজোড়া বিরহী হৃৎপিণ্ড।
জলের বোল ঢেউয়ের রোল হাওয়ার তোলপাড়ে
ভাঙা গলার বাঙাল কথা রাঙালো প্রাণমন
নারানগঞ্জের ইষ্টিমারে দুপুরবেলায়।

আষাঢ়ের একটি দিন

আজ দীর্ঘ দিন। আকাশের জ্যোতির্ময়
দীর্ঘ অর্ধ-বৃত্ত-পথে সূর্যের প্রচণ্ড পরিক্রমা
প্রায় শেষ। দিন শেষ। দীর্ঘ সন্ধ্যা, সন্ধ্যার সঙ্গমক্ষণে
থরোথরো কাঁপে রাত্রি, প্রথম রাত্রিতে স্ত্রীর মতো।

দিন, দীর্ঘ দিন। সময়ের শোভাযাত্রা
যেন শত-শত অশ্বারোহী, ধ্বজাবাহী, জয়ী, যোদ্ধা, রাজা,
কলরোল, সমারোহ!

রাত্রির তিমির-গর্ভ
ছিঁড়ে উষা আসে উচ্ছ্বাসে উল্লাসে, সোনালি বন্যার
তপ্তস্রোত। দীর্ঘ দীপ্ত দ্বিপ্রহর হীরার পাহাড়,
সূর্যের প্রাসাদ, অনির্বচনীয়
গৌরীশৃঙ্গ, দৃষ্টি-অন্ধ-করা
আলোকের উচ্চচূড়া। বিশাল বৈকাল
স্তব্ধ আলোর প্রপাত
সর্বপ্লাবী মত্তস্রাবী যেন কানায়-কানায়
জোয়ারের ভরা জল, কী উজ্জ্বল
আকাশে অশান্ত রং, রঙের উদ্দাম
অরণ্য ছড়ালো
মর্মর-মসৃণ মেঘে, গতিশীল স্থাপত্যের অস্থিরতা
সূর্যেরে জড়ালো
প্রগল্‌ভ প্রলাপে। কাঁপে সূর্যের শরীর
সোনালি বন্যার চাপে, সোনালি সন্ধ্যার
সৌন্দর্যে। সূর্যাস্তের জ্বলন্ত জঙ্গলে
দুরন্ত সোনালি বাঘ থাবা চাটে। ফাটে প্রহৃত পশ্চিম
রাত্রির প্রসবে। দিন, দীর্ঘ দিন
প্রায় শেষ। দিন শেষ। দৃষ্টি-অন্ধ-করা
উচ্চচূড়া হীরার পাহাড় ধ্ব'সে পড়ে; তীব্র নিঃশব্দ প্রপাত
—রঙের উদ্দাম অরণ্য-প্রলাপ—
মিশে যায় মুছে যায় আতাম্র পশ্চিমে। দিগন্তের
বিদীর্ণ হৃৎপিণ্ড থেকে বিচ্ছুরিত
একটি দীর্ঘ রক্তরেখা ধূসরিত আকাশের

দীর্ঘ অর্ধ-বৃত্তে করে দ্বিখণ্ডিত। এখনো, এখনো
—স্মৃতির দুর্মর নিভৃত মর্মর—
রাত্রির দুর্গম দুর্গের গম্ভীর
অন্ধকার-প্রাকারের রন্ধ্রপথে উৎসারিত
স্তব্ধ, সঙ্গীহীন,
তবু প্রগল্‌ভ রঙিন
দিন।

শান্তিনিকেতনে গ্রীষ্ম : বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা

অতিভোজনের নিশীথে যেমন নেমে আসে দুঃস্বপ্ন
এ-ঘন নিদাঘে তেমনি ধরণী মূর্ছায় আচ্ছন্ন।
ত্রাণ করো তারে, প্রাণ দাও, গাও উজ্জীবনের গান,
ওগো নবনীল জলধর, ওগো পুঞ্জিত পর্জন্য।

স্তম্ভিত তরুপল্লবলতা, শীর্ণ নির্ঝরিণী,
শিশু আর পাখি ক্ষান্তকাকলি ক্লান্ত।
দিগন্ত যেন কুয়াশা-জড়ানো, বিবর্ণ নভতল।
এ-মরণে করো শরসন্ধানে দীর্ণ
হে তাপ-হন্তা, নিদাঘ-নিষাদ, গম্ভীর পর্জন্য।

দীর্ঘ দিবস সান্ত্বনাহীন দীর্ঘশ্বাসে, রাত্রি নিদ্রাহরা,
তৃষিত শোষিত জীবলোক কাঁপে হতাশ্বাসে, রসনা নিরক্ষরা।
দাও ভাষা দাও, দুর্বহ প্রাণ রাঙাও আশার চিহ্নে,
হতচেতনেরে জয় করো, পর্জন্য।

বাতাসের এ কী উন্মত্ততা হ'লো সে অগ্নিবহ,
দগ্ধ করে সে ছুঁয়ে।
মাতাল তুফান তপ্ত পাতাল থেকে
উঠে এসে ছোটে হা-হা ক'রে ঝোঁকে-ঝোঁকে।

জলের শৈত্যে ঢুকেছে তাপের দৈত্য,
বস্তুমাত্রে তারি দুঃসহ দৌত্য।
সুখহীন প্রাণধারণের দিন সাঙ্গ করো,
বাঁচাও বাঁচাও নব আষাঢ়ের অঙ্গীকারে,
তাপ-অভিশাপে আপাতনিহতা বসুন্ধরারে রক্ষা করো
আনো আনো প্রাণ, হানো গান, হানো বর্ষণবারি পুণ্য,
ওগো সকরুণ শ্যামল তরুণ ঘন নীল পর্জন্য।

এসো এসো তুমি স্নিগ্ধ মধুর, এসো সুন্দর শান্তি।
জুড়াও নয়ন, জুড়াও জীবন, লাবণ্য ঢালো ভুবনে,
আলো অদ্ভুত বিদ্যুৎ, ছাড়ো বজ্রের স্বরে ডাক,
ত্রাসে কেঁপে ভেঙে যাক নিষ্ঠুর জ্যৈষ্ঠ।
এসো দুরন্ত অশান্ত চির চঞ্চল
দাও দেখা দাও দিগন্ত কালো ক'রে,
ছড়াও ছড়াও তারুণ্যসুধা করিয়ো না কার্পণ্য,
হে প্রেমিক বীর, হে বিজয়ী রাজা, প্রিয়তম পর্জন্য।

অতিভোজনের তন্দ্রা-জড়িমা হানো,
বনভোজনের উল্লাস-লীলা আনো,
জলহিল্লোলে তরুপল্লবে আকাশের নীলে টাটকা ঠাণ্ডা হাওয়ায়,
সূর্যসূদন সৌম্য ছায়ার ছোঁওয়ায়,
গন্ধে দৃশ্যে আনন্দে গানে রস-সিঞ্চনে রোমাঞ্চকর পরশে
প্রাণীলোকে পুনরুজ্জীবনের বাণী
শোনাও শোনাও ঝরঝর কলস্বরে,
আত্মদানের পূর্ণ আহুতি ছড়াও ছড়াও জনপদে প্রান্তরে,
শ্যামল সরস হর্ষে শস্যে ধরণীরে করো ধন্য,
ওগো রঙ্গিল আনন্দ, ওগো আসন্ন পর্জন্য।

শান্তিনিকেতনে বর্ষা

ছুটে এলো পিঙ্গল জন্তুর পাল। উত্তর-পশ্চিমে
দিগন্ত জঙ্গম হ'লো ঘূর্ণিত ধুলার কুহেলিতে।
ও কী পীত-আরক্ত মত্ততা তোলে আকাশ-কুট্টিমে
কম্পন! স্পন্দন জাগে স্তরে-স্তরে বায়ুমণ্ডলীতে,
আনন্দিত বনস্পতি হাত তুলে করে হৈ-চৈ
আকস্মিক তীব্র শীত উদ্দাম হাওয়ায়। এসো এসো,
হে তৃষ্ণার জল, ভাঙো গ্রীষ্মের গুমোর। তাথৈ তাথৈ
বিপ্লবী লাবণ্য আনো, সন্ত্রাসিক কারুণ্যে বিকাশো।

আহা এতক্ষণে বুঝি ফেটে গেলো অসহ্য গুমোট।
কে এলো বেরিয়ে? এলো ঝরঝর নববরিষন
গীতিকবিতার। বিশুষ্ক বীরভূম খুলে ক্লান্ত ঠোঁট
পান করে এই প্রাণ। হানে গান শান্তিনিকেতন
রবীন্দ্রনাথের মনে উদ্বেলিত সুরের লাভায়,
বৃষ্টি-থামা সন্ধ্যাকাশে, সূর্যাস্তের বিবাহ-আভায়।

ইলিশ

আকাশে আষাঢ় এলো; বাংলাদেশ বর্ষায় বিহ্বল।
মেঘবর্ণ মেঘনার তীরে-তীরে নারিকেলসারি
বৃষ্টিতে ধূমল; পদ্মাপ্রান্তে শতাব্দীর রাজবাড়ি
বিলুপ্তির প্রত্যাশায় দৃশ্যপট-সম অচঞ্চল।

মধ্যরাত্রি; মেঘ-ঘন অন্ধকার; দুরন্ত উচ্ছল
আবর্তে কুটিল নদী; তীর-তীব্র বেগে দেয় পাড়ি
ছোটো নৌকাগুলি; প্রাণপণে ফেলে জাল, টানে দড়ি
অর্ধ-নগ্ন যারা, তারা খাদ্যহীন, খাদ্যের সম্বল।

রাত্রিশেষে গোয়ালন্দে অন্ধ কালো মালগাড়ি ভরে
জলের উজ্জ্বল শস্য, রাশি-রাশি ইলিশের শব,
নদীর নিবিড়তম উল্লাসের মৃত্যুর পাহাড়।
তারপর কলকাতার বিবর্ণ সকালে ঘরে-ঘরে
ইলিশ ভাজার গন্ধ ; কেরানির গিন্নির ভাঁড়ার
সরস শর্ষের ঝাঁজে। এলো বর্ষা, ইলিশ-উৎসব।

ব্যাং

বর্ষায় ব্যাঙের ফুর্তি। বৃষ্টি শেষ, আকাশ নির্বাক ;
উচ্চকিত ঐক্যতানে শোনা গেলো ব্যাঙেদের ডাক।

আদিম উল্লাসে বাজে উন্মুক্ত কণ্ঠের উচ্চ স্বর।
আজ কোনো ভয় নেই—বিচ্ছেদের, ক্ষুধার, মৃত্যুর।

ঘাস হ'লো ঘন মেঘ ; স্বচ্ছ জল জ'মে আছে মাঠে।
উদ্ধত আনন্দগানে উৎসবের দ্বিপ্রহর কাটে।

স্পর্শময় বর্ষা এলো ; কী মসৃণ তরুণ কর্দম !
স্ফীতকণ্ঠ, বীতস্কন্ধ—সংগীতের শরীরী সপ্তম।

আহা কী চিক্কণ কান্তি মেঘস্নিগ্ধ হলুদে-সবুজে !
কাচ-স্বচ্ছ ঊর্ধ্বদৃষ্টি চক্ষু যেন ঈশ্বরেরে খোঁজে

ধ্যানমগ্ন ঋষি-সম। বৃষ্টি শেষ, বেলা প'ড়ে আসে ;
গম্ভীর বন্দনাগান বেজে ওঠে স্তম্ভিত আকাশে।

উচ্চকিত উচ্চস্বর ক্ষীণ হ'লো ; দিন মরে ধুঁকে ;
অন্ধকার শতছিদ্র একছন্দা তন্দ্রা-আনা ডাকে।

মধ্যরাত্রে রুদ্ধদ্বার আমরা আরামে শয্যাশায়ী
স্তব্ধ পৃথিবীতে শুধু শোনা যায় একাকী উৎসাহী

একটি অক্লান্ত সুর ; নিগূঢ় মন্ত্রের শেষ শ্লোক—
নিঃসঙ্গ ব্যাঙের কণ্ঠে উৎসারিত—ক্রোক্, ক্রোক্, ক্রোক্।

কুকুর

কী করুণা অদৃষ্টের!   পথে যেতে-যেতে
যেদিকে ফেরাই চোখ, কত যে কুকুর।
অভিজাত বিলাসী শৌখিন
গ্রেট-ডেন, আফগান-হাউণ্ড,
ধূর্ত-চোখ কুঞ্চিত-রোমশ টেরিয়র,
জীবন্ত পুতুল ঠিক ছোট্ট সীলাম।
আহা, কী সুন্দর!
তারপর বিশুদ্ধ স্বদেশি
সারমেয়-গণতন্ত্র, নির্ভীক স্বাধীন গোত্রহীন,
পথে-পথে তারস্বরে
'আত্মবলে আত্মরক্ষা' ওদের ঘোষণা।

ধন্য দয়া অদৃষ্টের!   শহরের পথে
ফুল নেই, পাখি নেই ; ক্লান্ত চোখ স্নিগ্ধ করে পথের কুকুর।
কত রং, কত যে ইঙ্গিতে রঙে বিচিত্র নক্‌শায় আঁকা
ওদের শরীর,
মেঘে-চাপা সূর্যাস্তের বিচ্ছুরিত আভা যেন,
যেন আষাঢ়ের
আকাশে মেঘের দ্বীপ সারি-সারি রাশি-রাশি।
পূর্ণ ওরা, প্রাণে পূর্ণ,

ওরা পুঞ্জ-পুঞ্জ প্রাণ,
সবুজের জ্বলন্ত মঞ্জরী ওরা,
যে-সবুজ জ্বালায় আগুন
অরণ্যে অসংখ্য রঙে
বসন্তের দিনে।

জোনাকি

এ কী
জোনাকি!
তুই কখন
এলি বল্ তো!
একলা
এই বাদ্‌লায়
কেন কল্‌কা-
তায় এলি তুই?
(এই সারারাতজ্বলা চিরদীপমালা দেয়ালি-আলোয়!)
তোর সঙ্গী
সব পাড়াগাঁর
পথে সারা-রাত
ঘন অন্ধ-
কারে জ্বলছে।
কোন সরকার দর-
কারে তার
এই শহরে
তোকে শফরে
আজ পাঠালো!

(এই চাঁদ-তারা-ঝরা ছায়া-ছেঁড়া চির-দেয়ালি-আলোয়!)
এ যে কল্‌কা-
তার পথঘাট,
নেই খাঁ-খাঁ মাঠ
নেই ঝোপঝাড়
নেই জঙ্গল,
তুই ফিরে যা
তোর পাড়াগাঁর
পচা পুকুরের
পাড়ে থমথমে
কালো রাত্তিরে
কর্ ঝল্‌মল্—
(জ্বল্, চঞ্চল তারা তারা-ভরা কালো আকাশ-তলে।)
এই কল্‌কা-
তায় রাত নেই,
নেই চুপচাপ,
তারা তাড়ানোয়
ঘুম কাড়ানোয়
ভরা সারা রাত।
তুই এ-ঘরে
কোন বিঘোরে
এলি দেয়ালে
ছাদে জানলায়
খাটে আলনায়
ঘুরে মরতে!
(এই আসবাব-ঠাসা হাঁশফাঁশ-করা গুমোট ঘরে!)
আমি একলা
এই বাদলায়

শুয়ে দেখছি
তোর ঝিকমিক
জ্বলে মশারির
কোণে চিকচিক,
ঘুম আসে না।
ভাবি, ঘুটঘুট
ঘোর রাত্তিরে
তোর সঙ্গীরা
তোকে ডাকছে
তুই ফিরে যা—
(তোরা মাঠ ভ'রে ফোটা সবুজ তারার দেয়ালি জ্বালা।)
যা ফিরে যা
তোর পাড়াগাঁয়—
না, না, একটু
দাঁড়া, দেখে নি'—
এই কলকা-
তায় বল্ তো
তুই কী দেখলি ?
(শুধু সারারাত ভরা ঘুমহারা চিরদেয়ালি জ্বালা ?)
তবু এটুকুই
লাভ এলি তুই
এই রাত্তিরে
ঘরে মিটমিট,
সারা শহরে
আমি একলা
তোকে দেখলুম
কত কাল পরে
ওরে জোনাকি !
(তুই ফুটলি ক্ষণিক তারা হ'য়ে এই গুমোট ঘরে !)

এই কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৩৫ থেকে ১৯৪২। ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায়, প্রধানত 'কবিতা'য় ও 'চতুরঙ্গে' এর অধিকাংশ রচনা প্রকাশিত হয়েছিলো। কয়েকটি কবিতা 'আধুনিক বাংলা কবিতা' কাব্য-সংকলনেরও অন্তর্গত আছে। 'দময়ন্তী' গ্রন্থন করবার পূর্বে কোনো-কোনো কবিতার নানারকম পরিমার্জনা করেছি। কবিতার নামও অনেক ক্ষেত্রে বদলানো হয়েছে। এখানে যে-আকারে কবিতাগুলি দেখা দিচ্ছে সেইটেই প্রামাণ্য পাঠ।

'চলচ্চিত্র' কবিতাটি 'একটি অসমাপ্ত কবিতা' নামে 'চতুরঙ্গে' প্রকাশিত হয়েছিলো। কবিতাটিকে সুসম্পূর্ণ করবার ইচ্ছা তিন বছর ধ'রে মনে-মনে লালন ক'রে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি। অসমাপ্ত আকারেই এই গ্রন্থে তাকে স্থান দিলুম।

এই কবিতাগুলির বিষয়ে আঙ্গিকের দিক থেকে দু' একটি কথা বলতে ইচ্ছা করি। বাক্‌ছন্দের সঙ্গে কাব্যছন্দের মিলন—এই ছিলো আমার সাধনা। রচনাকালে নিজের মনে-মনে নিম্নলিখিত অনুশাসন গ্রহণ করেছিলুম:

(১) বাক্যবিন্যাসের মৌখিক রীতি থেকে চ্যুত হবো না।

(২) 'সাধু' ক্রিয়াপদ 'হইবে' 'বলিব' 'করিতেছে' প্রভৃতি ব্যবহার করবো না।

(৩) 'কাব্যিক' ক্রিয়াপদ 'ফুটি' 'চলিছে' 'হতেছে' ইত্যাদিও বর্জনীয়।

(৪) 'কাব্যিক' শব্দকে সম্পূর্ণ বয়কট ক'রে চলবো। 'মম' 'তব' 'কভু' 'যেথা', 'মোদের' 'সাথে' 'মাঝে' 'আঁধার' 'সনে' 'যবে' 'মতন' 'পরান' এই ধরনের কথাগুলিকে কাছেই ঘেঁষতে দেবো না।

(৫) মতো অর্থে প্রায়, দাও অর্থে দেহ, দেখতে অর্থে দেখিবারে, এলাম অর্থে এনু, পারি না অর্থে নারি এ-সবও নির্মমরূপে বর্জনীয়। প্রতিশব্দ এড়িয়ে চলবো। হাতকে হস্ত, গাছকে তরু, ফুলকে পুষ্প, হাওয়াকে পবন, পৃথিবীকে ভুবন বলবো না। মুখের কথায় এদের যা বলি কবিতাতেও তা-ই বলবো। অধিকরণে -'তে' ('ঘরেতে,' 'টেবিলেতে') পশ্চিমবঙ্গের মৌখিক রীতি হ'লেও, কিংবা সেইজন্যেই, প্রাদেশিকতা ব'লে বর্জনীয়।

(৬) অথচ এরই সঙ্গে ভাষা হবে সুগম্ভীর সাংস্কৃতিক; সংস্কৃত শব্দ বেশি ক'রে নিলে রচনায় যে দৃঢ়তা ও সংহতি আসে সেটা ছাড়বো কেন? সূর্যকে রবি কিংবা আকাশকে গগন বলবো না, কেননা ওগুলো আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহারের কথা, কিন্তু 'রতি-হ্রস্ব' কি 'স্বতঃশ্লথ' বলতে দোষ নেই, কেননা ও-ধরনের কথা আমাদের মৌখিক আলাপে কখনো ব্যবহৃতই হয় না।

এই অনুশাসনগুলি মেনে নিয়ে কাব্য রচনা সহজ হয়নি। 'বন্দীর বন্দনা' 'কঙ্কাবতী'র কবিতা হু-হু ক'রে লিখেছিলুম, কিন্তু 'দময়ন্তী'র এক-একটি কবিতা লিখতে বিস্তর সময় লেগেছে, প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে। আশা করি সে-পরিশ্রমের চিহ্ন কবিতাগুলির মুখশ্রীকে মলিন করতে পারেনি। গদ্যের পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে কাব্যের আবেগ-সঞ্চারী স্বভাবের মিলন ঘটাতে চেয়েছি। দেখা গেছে এ দু'য়ের সম্বন্ধ তেল-জলের সম্বন্ধ নয়। এখানে ব'লে রাখি যে এই গ্রন্থে একটিও গদ্যকবিতা নেই। কোনটা গদ্যকবিতা আর কোনটা গদ্যকবিতা নয় সে নিয়ে অনেক গুণীজনের মনেও সংশয় উপস্থিত হ'তে দেখেছি, সেইজন্য কথাটা উল্লেখ করলুম। কাব্যরচনার যে-বহুব্যবহৃত পদ্ধতি থেকে মুক্তির চেষ্টায় গদ্য কবিতার উদ্ভব, সে-মুক্তি পদ্যে আবদ্ধ থেকেও অর্জন করা অসম্ভব নয়। আমি দেখছি পদ্যকে দিয়েও গদ্যকবিতার কাজ করিয়ে নেয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ তা বহুবার করেছেন। অধুনা পদ্যের সেই রূপটিই আমার মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করছে। 'পরিশেষ' 'জন্মদিনে' 'শেষ লেখা' প্রভৃতিকে অনেকে ভুল ক'রে গদ্যকবিতা বলেন। এখানে সতর্কতা দরকার। পদ্য, অথচ গদ্যকবিতার মতো মৌখিক ভাষায় গঠিত, বাংলা পদ্যের নতুন পরিণতি বোধ হয় এই দিকেই।

বলা বাহুল্য, তালিকাভুক্ত নিয়মগুলি সম্পূর্ণ মেনে চলা সম্ভব হয়নি। বিচ্যুতি ঘটেছে। 'যেদিন শরীরে তোর মুঞ্জরিবে—' ('দময়ন্তী'), কালের কুটিল গতি গর্ভবতী করিবে কঙ্কালে' ('ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা'), 'বৃষ্টির ঝর্ঝর সুর ঝরিছে মধুর' ('ছন্দ') দুটি 'কাব্যিক' ও একটি 'সাধু' ক্রিয়াপদ পাওয়া গেলো। 'যে-ভয়ে কখনো গান্ধির কভু অরবিন্দের চরণ শরণ' না-লিখে পারিনি। 'শান্তিনিকেতনে গ্রীষ্ম' কবিতায় অকপটেই 'কাব্যিক' রীতিকে স্বীকার ক'রে নিয়েছি, কিন্তু এ-স্বীকৃতি এ-বইয়ের ঐ একটিমাত্র কবিতাতেই। 'পূর্বরাগে' ধরণীকে এড়াতে পারিনি, 'সাগর-দোলা'য় সাগরকে সগৌরবে জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছে। সাবধানী পাঠক অন্বেষণ করলে আরো ব্যতিক্রম হয়তো পাবেন, কিন্তু খুব বেশি পাবেন না। মোটামুটি, এবং যথাসম্ভব যত্নে নিয়মগুলি মেনে চলেছি।

বাক্‌রীতির সঙ্গে কাব্যরীতির মিলনের শ্রেষ্ঠ বাহন কোন ছন্দ? ছন্দো-বিচারে পাণ্ডিত্যের অধিকারী আমি নই কিন্তু কাব্যরচনায় আমার অভিজ্ঞতা থেকেই এ-বিষয়ে যদি কিছু বলি বিজ্ঞ ব্যক্তিরা অপরাধ নেবেন না। এটা দেখা যাবে যে 'দময়ন্তী'র বেশির ভাগ কবিতাই পয়ারজাতীয় ছন্দে রচিত। এটা দৈবাৎ হয়েছে তা বলতে পারিনে। কেননা নানা সময়ে নানা কবিতা লিখতে ব'সে এই ধারণাই আমার মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে যে

বাক্‌রীতির সঙ্গে কাব্যরীতি মেলাতে হ'লে পয়ারই শ্রেষ্ঠ বাহন। বস্তুত, বাঙালির কথা বলবার স্বাভাবিক ছন্দই পয়ার ছন্দ। সকলেই জানেন যে পয়ারে অনেকখানি ফাঁক থাকে যেটা কবি ইচ্ছামতো ভ'রে নিতে পারেন কিংবা ফাঁক রাখতে পারেন। এইটেই পয়ারের বিশেষত্ব। এরই জন্যে মুখের ভাষার সঙ্গে তার সহজ আত্মীয়তা। কোনো একটি শব্দ, কিংবা বাক্যগঠনের কোনো ভঙ্গি এড়াতে হ'লে পয়ারে তার অনেক রাস্তা খোলা পাওয়া যায়। আবার যে-শব্দটি, বাক্যগঠনের যে-ভঙ্গিটি বাঞ্ছনীয়, তার জন্যেও কোনো-না-কোনো দরজা খোলা থাকেই। পয়ারের অফুরন্ত সঙ্কোচন-সম্প্রসারণশীলতার জন্যই এটা সম্ভব হয়। পয়ারকে নিয়ে কী যে করা যায় আর কী যে করা যায় না তার কোনো সীমানা আছে ব'লে মনে হয় না। লঘু ও ভারবান, দ্রুত ও মন্থর, গম্ভীর ও চপল সবই সে হ'তে জানে। গভীরতম চিন্তা থেকে লঘুতম পরিহাস—মনের সকল মহলেই তার অবাধ আনাগোনা। বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের পাশেই মুখের একটা চলতি বুলি সহজেই সে নিজের মধ্যে মানিয়ে নেয়। একই কবিতায় মননশীলতা ও ব্যঙ্গ, বাস্তবিকতা ও কল্পনা, এই ধরনের আলাদা-আলাদা সুর পাশাপাশি বসাতে হ'লে পয়ারের মতো প্রশ্রয় কোথাও পাওয়া যায় না। যুক্তাক্ষর চাপিয়ে তাকে দৃঢ় করো, গম্ভীর করো, আবার যুক্তাক্ষরের গ্রন্থি শিথিল ক'রে দিয়ে তাকে ঝর্নার মতো নাচাও। অনেকটা কম হ'য়ে গেলো, টেনে পড়ো; কিছুটা বেশি হ'লো, চেপে দাও। কিছুতেই যেন ছন্দপতন হ'তে চায় না। পয়ার শতরূপী ও সর্বব্যাপী। পৃথিবীর আর-কোনো ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করবার এমন একটি আশ্চর্য যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে কিনা জানিনে।

পয়ারের পরেই ছড়ার ছন্দ। এ-ছন্দেও ঠিক পয়ারের মতোই অনেক ফাঁক থাকে; পয়ারের মতোই এর হালকা অংশ টেনে পড়ি ও ভারি অংশ চেপে পড়ি, মোট ওজন সমান থাকে। পয়ার আর ছড়ার ছন্দে মূলত কোথাও একটা খুব বড়োরকমের মিল নিশ্চয়ই আছে, নয়তো এটা কী করে সম্ভব হয় যে একই পংক্তি ছড়ার ছন্দেও পড়া যাচ্ছে, আবার পয়ার ক'রে পড়লেও তার জাত যাচ্ছে না? 'ঘরেতে দুরন্ত ছেলে করে দাপাদাপি' রবীন্দ্রনাথের এ-পংক্তি স্পষ্টই পয়ারজাতীয়, কিন্তু এটি 'বিষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর' কবিতায় নিখুঁত ছড়ার ছন্দে বসানো আছে। এ-সাদৃশ্য আকস্মিক নয়, চারিত্রিক; আমাদের গ্রাম্য ছড়ায় এমন অনেক পংক্তিই পাওয়া যায়, যা রীতিমতো পয়ারে চালিয়ে দেয়া যায় অথচ ছড়ার ছন্দ থেকেও তা বিচ্যুত নয়। অথচ পয়ারে ও ছড়ার ছন্দে মস্ত একটা প্রভেদও আছে, সেটা আমরা কানে

শুনতে পাই। দুই ছন্দেই দুই স্বতন্ত্র সুর। এ-প্রভেদটি ঠিক কোথায় সেটা ছান্দসিকের আলোচ্য।

অনেকের মনে হ'তে পারে যে যেহেতু বাংলার অশিক্ষিত অচেতন মন ছড়ার ছন্দেই নিজেকে প্রকাশিত করেছে সেইজন্য এই ছন্দই আমাদের মৌখিক ভাষার সবচেয়ে কাছাকাছি। কিন্তু কবিতা লিখতে ব'সে দেখা যায় যে এ-ধারণাটি ঠিক নয়। পয়ারের বিশাল মুক্তি ছড়ার ছন্দে নেই, তা অনেকটা সীমাবদ্ধ। অনেক কথা আছে যা এ-ছন্দে ঢোকে না, অনেক ভাব আছে যা এ-ছন্দ বহন করতে পারে না। যদিও হচ্ছে দিচ্ছে প্রভৃতি ক্রিয়াপদগুলি এতে পয়ারের চাইতে সহজে ঢোকে, তবু অন্য অনেক 'কাব্যিক' কথা আছে যা বর্জন ক'রে তার দেহরক্ষা দুরূহ হয়। (অধিকরণে-'তে' উপসর্গটির বাহুল্য এ-ছন্দে লক্ষ্য করবার।) তাছাড়া গাম্ভীর্য এর প্রকৃতিগতই নয়, অপেক্ষাকৃত লঘুরসের কবিতাই এতে সম্ভব, এবং এ-ছন্দ কিছুক্ষণ পরেই একঘেয়ে ঠেকে। পক্ষান্তরে পয়ারের বৈচিত্র্য অন্তহীন।

রবীন্দ্রনাথ যাকে তিন মাত্রার ছন্দ বলতেন, যাতে তাঁর অনেক কবিতা ও বেশির ভাগ গান রচিত, সে-ছন্দ স্বভাবতই মৌখিক ভাষার সবচেয়ে দূরে। এ-ছন্দ একেবারেই আঁটোসাঁটো, মাপাজোকা, প্রতিটি মাত্রা কথা দিয়ে-দিয়ে ভরিয়ে চলতে হবে, একটুও ফাঁক কোনোখানে নেই। ছোটো গীতিকবিতার পক্ষে এ-ছন্দ খুব উপযোগী, কিন্তু কবি যেখানে নাটকীয় বৈচিত্র্য-প্রয়াসী সেখানে এ-ছন্দ কোনো কাজেই লাগে না। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে বাংলা ভাষার কাব্য-নাট্য কি নাটকীয় কাব্য সবই যে পয়ারে লেখা তাতেই প্রমাণ করে যে মৌখিক ভাষার ছন্দের সঙ্গে পয়ারেরই আন্তরিক মিল সবচেয়ে গভীর। এর একমাত্র ব্যতিক্রম বোধ হয় 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা', সেখানে পরিহাসপ্রধান বিষয়ের জন্য তিন মাত্রার ছন্দ মানিয়েছে। তবু বলবো যে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' 'পরিশেষে'র পয়ারে লেখা যেতো, কিন্তু 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' তিন মাত্রার ছন্দে কখনোই নয়। পদ্যে নাটক কিংবা নাটকীয় কাব্য লিখতে হ'লে বাঙালি কবির পয়ারই আশ্রয়; ছড়ার ছন্দের গুনগুনানি সুর কিংবা তিনমাত্রার সুনিয়ন্ত্রিত মধুরতা এ-ক্ষেত্রে তাঁকে বর্জন ক'রে চলতেই হয়। পয়ারের সঙ্গে অন্য দুটি ছন্দের জাতিগত পার্থক্য কবিতার আবৃত্তি শুনলেও ধরা পড়ে। 'দেবতার গ্রাসে'র আবৃত্তি এমনভাবে হওয়া সম্ভব যাতে প্রায় মুখের কথা শুনছি ব'লেই মনে হয়, কিন্তু 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে' কিংবা 'আনমনা গো আনমনা'র আবৃত্তি পদে-পদেই বুঝিয়ে দেবে যে এটা পদ্য, এর ঝোঁকগুলি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট, এ গদ্য থেকে একেবারেই আলাদা জাতীয় ভাষা। কাব্যিক শব্দ ও সাধু ক্রিয়াপদগুলিকে যদি পয়ার থেকে নির্বাসিত করা

হয় তাহ'লে সঙ্গে-সঙ্গেই তা মৌখিক ভাষার ঠিক ততটাই অনুরূপ হ'তে পারে, কবিতার পক্ষে যতটা হওয়া সম্ভব। অথচ তা গদ্য নয়, গদ্যছন্দও নয়। ছন্দোবন্ধনের মাধুর্যের সঙ্গে কথ্য ভাষার সতেজ প্রাণশক্তির সমন্বয়।

এই গ্রন্থের কোনো-কোনো কবিতায় আমি পয়ারের ব্যবহারে প্রথা-পথের বাইরে দু'একটি পরীক্ষা করেছি। পয়ারে বিজোড় মাত্রার স্থান নেই এ বহুকালের পুরোনো কথা, কিন্তু 'হে কাল!' কবিতায় আমি সাহস ক'রে লিখেছি—

> হাজার জাহাজডুবি রেখে গেছে বণিকের নাবিকের হাড়,
> পাহাড়। . . .
> উজ্জ্বল আলোর মতো অলঙ্কার, রক্তের মতো লাল
> প্রবাল। . . .
> পূর্ণ ক'রে দেবে এই শীর্ণ শতাব্দীর
> শরীর। . . .
> দিনে-দিনে তিলে-তিলে মুঞ্জরিত প্রাণপুঞ্জ, রক্তের মতো লাল
> প্রবাল। . . .

এখানে 'পাহাড়' 'শরীর' ও 'প্রবাল' কানকে পীড়িত করা উচিত, কিন্তু পীড়িত করবে না, ঠিক মানিয়ে যাবে যদি পাহাড়ের হা, শরীরের রী ও প্রবালের বা একটু টেনে পড়ি। সুখের বিষয় তিনটিই দীর্ঘ স্বর, এবং পংক্তির শেষে আছে ব'লে দীর্ঘ ক'রে পড়বার স্বাভাবিক ঝোঁকও আমাদের হয়। আসলে কথাগুলি দেখতে যদিও তিন মাত্রা, একটু টেনে প'ড়ে চার মাত্রার ওজন তাদের সহজেই দিতে পারি। পয়ারে এ-রকম টেনে পড়াটা কিছু অন্যায় নয়, হামেশাই ও-রকম পড়তে হয়, পাখি সব করে রব পড়তেও সব আর রব-কে অনেকখানি না-টানলে ছন্দই থাকে না। হসন্ত অক্ষরের আগের স্বরেরদীর্ঘতা বাংলা উচ্চারণের সাধারণ নিয়ম। এখানে পাহাড় আর প্রবালকে টেনে পড়ার আভ্যন্তরীণ কারণও কিছু আছে ব'লে আমার মনে হয়, স্তবকের শেষে পূর্বসঞ্চিত বিষণ্ণতা যেন একটি দীর্ঘশ্বাসের মতো এই দীর্ঘ স্বরের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হ'লো ; যেটা শেষ হবার সেটা পরিপূর্ণরূপেই শেষ হ'য়ে গেলো।

তাহ'লে দাঁড়াচ্ছে এই যে দৃশ্যত যেটা তিন মাত্রা সেটা শ্রাব্যত চার মাত্রা হ'তে পারে। এর আর-একটা উদাহরণ মনে পড়ছে। 'বিদেশিনী' ব'লে একটা কাব্যকাহিনী লিখেছিলুম, তাতে আছে :

> এরা তো বাঙালি নয়, কী ক'রে বুঝবে
> মা, বাবা, ভাই, বোন, স্বামী, স্ত্রী
> এ-সব কথার মানে কী।

এটা লেখবার সময় কিছুই মনে হয়নি, কোনো সমালোচক বন্ধুও কিছু বলেননি, কিন্তু হঠাৎ সেদিন আমার নিজেরই মনে হ'লো যে এখানে মা, স্ত্রী, কী এ তিনটি একাক্ষরা কথায় ছন্দের তো কাৎ হ'য়ে পড়া উচিত ছিলো, কিন্তু তা হয়নি কেন ? ভেবে দেখলুম না-হবার কারণটা খুব সহজ। এক মাত্রার কথাগুলিকে অচেতন প্রবৃত্তি থেকেই টেনে প'ড়ে আমরা মনে-মনে দুই মাত্রার মূল্য দিয়ে ব'সে আছি, তাই এতে যে রীতিবিরুদ্ধ কিছু আছে পড়বার সময় তা আমাদের মনেই হয় না। যদি লিখতুম

মাতা, পিতা, ভাই, বোন, পত্নী, স্বামী
এ-সব কথার কী যে মানে।

তাহ'লে যা হ'তো এও তাই, কিন্তু ঠিক তাও নয়। এ দুয়ের মধ্যে কোনটা যে ভালো তা আশা করি কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। যেটা লিখিনি সেটা যে আড়ষ্ট লাগছে, দুর্বল বোধ হচ্ছে, তার কারণ এখানে ছন্দের নিয়মরক্ষাই হয়েছে, প্রাণরক্ষা হয়নি। যেটা লিখেছি, সেটা শব্দচয়নে ও বাক্যবিন্যাসে হুবহু মুখের কথার মতো ব'লে সহজ ও জোরালো লাগছে, তার উপর মা, স্ত্রী, ও কী-তে কিছু জায়গা ছেড়ে দিয়েছি ব'লে কমাগুলি জিরোবার জায়গা পেয়েছে ও প্রশ্নটা তীব্র হ'তে পেরেছে। চোখের বিচারে এতে ছন্দের খুঁত আছে কিন্তু সেটা ভুল বিচার, কান একেই সাগ্রহে বরণ করে। ঠিক এইরকম 'চলচ্চিত্র' কবিতার

এখন তাহ'লে করা
কী ?

এখানে 'কী' দেখতে একমাত্রা হ'লেও আসলে দুই মাত্রা। টেনে পড়তে হয় ব'লে প্রশ্নটার মর্মান্তিকতা অধিকতর পরিস্ফুট।

চোখে-দেখার ছন্দের চাইতে কানে-শোনার ছন্দকে আমি সর্বত্রই প্রাধান্য দিয়েছি। আমাদের কথ্য ভাষায় অসংখ্য যুক্তাক্ষর আছে যা চোখে দেখা যায় না, যেমন বাংলা, হলদে, টুকরো, পাগড়ি, খাজনা। এ-সব শব্দ এতকাল আমাদের পয়ার-কাব্যে হয় ব্যবহৃত হ'তো না, কিংবা ব্যবহৃত হ'লেও অক্ষর-গুনতি মাত্রার মূল্য পেতো। শব্দটিতে তিনটি অক্ষর থাকলে তিন মাত্রা ধরা হ'তো, চারটি কি পাঁচটি থাকলে চার কি পাঁচ। এই কথাগুলি থেকে আমরা কাব্যের রাজত্বে পুরো খাজনা আদায় ক'রে নিচ্ছি না এ-কথা অনেক দিন আগেই আমার মনে হয়েছিলো। ভেবে দেখেছিলুম 'আমরা' কথাটির আমরা মুখে যে-উচ্চারণ করি সে-অনুসারে ওটা দু' মাত্রাই, অথচ আমাদের পয়ারে কখনোই ওর প্রতি সে-রকম ব্যবহার দেখিনি। 'এখন বিকেল' কবিতাটিতে যখন লিখেছিলুম :

আমরা আজ দুঃসাহসী সমুদ্র-দস্যুর মতো

চলো লুঠ ক'রে আনি বিকেলের রূপকথা-দ্বীপেরে,

কিংবা এখনো বিকেল আসে চুপি-চুপি কলকাতায়

তখন মনে-মনে ভয় ছিলো, কারণ বহুকালের অভ্যাসের মোহ কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। এ-পথে হঠাৎ খুব বেশি অগ্রসর হ'তে সাহস পাইনি। আমি যখন সাবধানে পথ হাৎড়িয়ে ফিরছি তখন সুভাষ মুখোপাধ্যায় অতি অল্প বয়সে তাঁর 'পদাতিকে'র আশ্চর্য কবিতাগুলি লিখে আমাকে চমক লাগিয়ে দিলেন। তাঁর হাতেরই ধাক্কায় বাংলা ছন্দের নতুন একটি মহল খুলে গেলো, তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করেছি। 'গোলদিঘি' 'ভারতবর্ষ' 'অনেকদিন' 'খিদিরপুর' এ-সমস্ত শব্দেরও গুপ্ত যুক্তাক্ষর তাঁর কানে বেজেছে, এতে আমার মন বার-বার বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছে। 'মোরা' শব্দকে এড়াবার সব-চেয়ে সহজ উপায় যে আমরা-কে খুব স্বাভাবিকভাবে 'আম্রা' উচ্চারণ করা এ-কথা বিশ্বাস করবার জোর পেলুম সুভাষের কবিতা প'ড়ে। 'ইলিশ' কবিতায় লিখেছি :

আকাশে আষাঢ় এলো, বাংলাদেশ বর্ষায় বিহ্বল।

মনে পড়ে 'বাংলাদেশ' কথাটি এখানে একটু সচেতনভাবেই বসিয়েছিলুম। দশ বছর আগে হ'লে বসাতে পারতুম কি? খুব সম্ভব পারতুম না। খুব সম্ভব বঙ্গদেশ লিখতুম, তাতে পংক্তিটি আমার মতে অনেক খারাপ হ'তো। 'শান্তিনিকেতনে বর্ষা' কবিতায় আছে :

. . .বিশুষ্ক বীরভূম খুলে ক্লান্ত ঠোঁট

পান করে এই প্রাণ. . .

আমি বিশ্বাস করি, এখানে তিনমাত্রিক বীরভূম পংক্তিটিকে একটু বেশি গাঢ়তা দিয়েছে। পাঠক মনে-মনে 'শুষ্ক বীরভূম' ক'রে নিয়ে তুলনা ক'রে দেখতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আরো বলা যায় যে 'তার উপর' কথাটি খুব স্বাভাবিকভাবে তারুপর (কি তারোপর) উচ্চারণ করলে পয়ারে অনায়াসে চারমাত্রিক জায়গা পায়, 'হ'য়তো' দু'মাত্রা হ'তে কোনোই আপত্তি করে না। পাঠক একটু চিন্তা করিলে এ-রকম আরো অনেক কথা তাঁর মনে পড়বে।

অবশ্য আমি এ-কথা বলি না যে যেখানেই অদৃশ্য যুক্তাক্ষর পাওয়া যাবে সেখানেই এই কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। এ-বিষয়ে মন সম্পূর্ণ খোলা রাখাই ভালো। যখন যে-রকম দরকার তা-ই করবো। যখন যে-ধ্বনিটি, যে-ব্যঞ্জনাটি চাই ঠিক তারই অনুসারে যুক্তাক্ষরগুলি সাজাবো।

যেগুলি দৃশ্যতই যুক্তাক্ষর, দরকার হ'লে তাদেরও গ্রন্থি আলগা ক'রে কানের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে কুণ্ঠা করবো না।

উজ্জ্বল আলোর মতো অলঙ্কার, রক্তের মতো লাল—

এখানে একই পংক্তিতে যুক্তাক্ষরের প্রতি দু'রকম ব্যবহার করেছি; 'উজ্জ্বল' তিন মাত্রা, 'রক্তের' চার মাত্রা। একই কবিতায় এইরকম মিশ্রণের পক্ষপাতী কিছুকাল পূর্বে আমি ছিলুম না, কিন্তু এখন এতে আমি কোনো দোষ তো দেখিই না উপরন্তু এ-কথাও মনে হয় যে এইরকম মিশ্রণ ব্যতীত পয়ারের বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ উদ্ঘাটন করা বোধ হয় সম্ভবই নয়।

এবারে মিলের কথা। বাংলায় সব মিলই যে যুগ্মস্বরের মিল কিংবা ইংরেজি মতে 'মেয়েলি' মিল এ-কথা আজকের দিনে নতুন নয়। অবশ্য এই যুগ্ম-মিলের প্রবর্তন রবীন্দ্রনাথই করেন, প্রাক্-রবীন্দ্র যুগে এক মাত্রার মিলে কারো কানে খটকা লাগতো না। কয়েক বছর আগে অজিত দত্ত 'কবিতা'য় একটি প্রবন্ধে এক স্বরের মিল ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব করেন। তাঁর এই প্রস্তাবে আমার আন্তরিক সমর্থন ছিলো। ভেবে দেখলে দেখা যাবে এই যুগ্ম-মিলের সংস্কারে আমাদের কাব্যের স্বাভাবিক প্রকাশ অনেক স্থলেই ব্যাহত হয়েছে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাব্য থেকে তার উদাহরণ দেয়া যায়। মিলের খাতিরে শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণ বিকৃত করতে রবীন্দ্রনাথও কখনো-কখনো বাধ্য হয়েছেন :

দুগ্ধফেনশয়ন করি আলা
স্বপ্ন দেখে ঘুমায়ে রাজবালা। ('সোনার তরী'—'নিদ্রিতা')

'আলা' কথাটি এখানে শ্রুতিকটু তাতে সন্দেহ কী। 'আলো' বলতে পারলে কত ভালো হ'তো! এখানে না-হয় কোনো উপায়ই ছিলো না, কিন্তু ওরই ঠিক পরের কবিতায় ('সুপ্তোত্থিতা') 'মালা' ও 'বালা'র সঙ্গে মেলাবার জন্য 'উতলা'কে তিনি 'উতালা' লিখেছেন—নিতান্তই যুগ্মমিলের সংস্কারের বশবর্তী হ'য়ে। 'উতালা'র কোনো দরকার ছিলো না, উতলাই যথেষ্ট মিল হ'তো। কদাচ কখনো এইরূপ ক্ষেত্রে শব্দকে তিনি অবিকৃতই রেখেছেন, যেমন 'চিত্রা'র 'নগরসংগীত' কবিতায় 'কাকলি' র সঙ্গে 'আকুলি' মিলিয়েছেন, কাকলি-কে কাকুলি লেখেননি। কাকলি-আকুলি কানে সইলে উতলা-বালার অপরাধ কী? বস্তুত, দুটোই যে ভালো মিল, যে-কোনো কাব্যপ্রেমিক সততার সঙ্গে আপন কান দিয়ে পরীক্ষা করলেই তা উপলব্ধি করবেন।

যুগ্ম-মিল যে আমাদের একটা সংস্কার মাত্র, তাও চোখের সংস্কার, তার আরো প্রমাণ দিচ্ছি। অজিত দত্ত তাঁর প্রবন্ধে বলেছিলেন

যে 'বাংলায় হসন্ত শব্দে এক স্বরের মিল চলে এবং মোটামুটি ভালো মিল বলেই গণ্য হয়।' খুব সত্য কথা। 'মন-বন', 'গান-কান' 'সুর-দূর' ইত্যাদি অসংখ্য মিল বাংলা কবিতায় সর্বদা চ'লে আসছে; এগুলি সবই একমাত্রার মিল, অথচ যে-হেতু চোখে দেখতে দুটো অক্ষর সেইজন্যে এদের বিরুদ্ধে কখনো কোনো আপত্তি শোনা যায় না। এ-সব মিল যাঁরা অনায়াসে মেনে নেন তাঁরাই কখনো 'পাখি'র সঙ্গে 'দেখি' কিংবা 'শুনি'র সঙ্গে 'বাণী' মিল দেখলে আঁৎকে ওঠেন, ও রকম মিল নাকি কবির অক্ষমতারই পরিচয়। অথচ 'শুধু-বঁধু' 'ব্যথা-কথা' এ দুটি একস্বরের মিল আমাদের কাব্যে বহুলপ্রচলিত, এ-বিষয়েও অজিত দত্ত উল্লেখ করেছিলেন। শুধু-বঁধু যদি কর্ণপীড়ন না করে দেখি-পাখিও করতেই পারে না। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের রচনায় একমাত্রার মিল প্রচুর আছে, 'সোনার তরী'তে বেত-দিত মিল পাওয়া যায়, ('রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে'), তাতে ঐ অনিন্দ্য কবিতার উপভোগ্যতা কিছুমাত্র হ্রাস হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের মিল সম্বন্ধে আর-একটা কথা উল্লেখযোগ্য। তোলে ফোটে ছোটে প্রভৃতি কথার বানান কবিতায় তিনি লিখতেন তুলে ফুটে ছুটে—অন্তত অনেকদিন পর্যন্ত তা-ই লিখতেন—এবং কখনো-কখনো এদের সঙ্গে এমন-সব মিল দিতেন, যেগুলি চোখে দেখতে যুগ্ম মিল, বস্তুত এক স্বরের মিল। যেমন বিখ্যাত 'দুরন্ত আশা' কবিতায় :

বিপদ মাঝে ঝাঁপায়ে পড়ে
    শোণিত উঠে ফুটে ;
সকল দেহে সকল মনে
    জীবন জেগে উঠে।

এখানে 'উঠে' মানে 'ওঠে', উচ্চারণও তা-ই, অন্তত তা-ই হওয়া উচিত। তা ছাড়া ক'রে-ঝরে, দোলে-চলে ইত্যাদি মিল আসলে একস্বরের হলেও 'ভালো' মিল ব'লেই সাধারণত স্বীকৃত। এ-রকম উদাহরণ আরো অনেক সংগ্রহ করা সম্ভব, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। এই ধরনের মিলগুলিকে আমরা যে বিনা দ্বিধায় যুগ্ম-মিল ব'লে গ্রহণ ক'রে এসেছি তাতে এইটেই বোঝা যায় যে আমরা সাধারণত চোখ দিয়ে মিল দেখি, কান দিয়ে মিল শুনিনে।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের মিলের খুঁত ধরা আমার উদ্দেশ্য নয়। হাজার-হাজার কবিতায় ও গানে পদে-পদে যুগ্ম মিল অর্থের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে তিনি এমন নিখুঁতভাবে দিয়ে গেছেন যে তা চিরকাল আমাদের বিস্ময়ের বস্তু হ'য়ে থাকবে। আমি শুধু বলতে চাই যে যুগ্ম মিলের—কিংবা প্রথাগত

'ভালো' মিলের—আবশ্যিক তাগিদে তাঁর মতো বিরাট প্রতিভাকেও কখনো-কখনো বিপদে পড়তে হয়েছে; তাঁর রচনা থেকেও এমন পংক্তি উদ্ধার করা সম্ভব, যে-কোনো উপায়ে 'ভালো' মিল দেবার দায় না-থাকলে যা আরো উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটতো। অজিত দত্ত উল্লিখিত 'গুপ্ত প্রেম' কবিতার লাগিয়া-ভাগিয়া দৃষ্টান্ত অনেকেরই মনে পড়বে। এ-কথা সত্য যে বাংলা ভাষায় মিলের ঐশ্বর্য স্বভাবতই খুব বেশি, আর এটাও রবীন্দ্রনাথেরই আবিষ্কার, তাই যুগ্ম-মিলের তিনিই প্রবর্তক। এত অজস্র বিচিত্র যুগ্ম-মিল যে আমাদের ভাষায় ইতস্তত ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের আগে আমরা তা এমন ক'রে জানিনি—ভারতচন্দ্র কি ঈশ্বর গুপ্তের মিল রবীন্দ্রনাথের তুলনায় ছেলেখেলা। এই ঐশ্বর্যের যথার্থ ব্যবহার বাঙালি কবিরা নিশ্চয়ই করবেন, আমাদের কাব্যে যুগ্ম-মিলই প্রধান থাকবে। ইংরেজিতে যুগ্ম-মিলে কবিতার স্বর হালকা হ'য়ে যায়, বাংলায় তা হয় না, বাংলায় গাম্ভীর্যের সঙ্গে তার বিরোধ নেই, তাই আমাদের কাব্যে তার ব্যাপক ব্যবহার হ'তে বাধ্য। আমার বক্তব্য শুধু এই যে মিলটাকেই যেন প্রাধান্য না-দেয়া হয়, মিলের খাতিরে কবিত্বকে খর্ব করা না হয় যেন, যা বাংলা কবিতায় অনেক সময় হ'য়ে থাকে। একস্বরের মিল যে খারাপ মিল, সেটা যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁরা যে অবশ্যতই অক্ষম কবি, এই সংস্কারের উচ্ছেদ আমি কামনা করি। এর পিছনে অভ্যাসের জড়িমা ছাড়া আর-কিছু নেই। আসলে এক স্বরের মিল শ্রুতিকটু মোটেও নয়, দৃষ্টিকটুমাত্র। কবিতার পাঠকদের আমি এই অনুরোধ জানাই তাঁরা যেন চোখের চাইতে কানের ব্যবহার বেশি করেন, তাহ'লে আশা করা যায় কিছুদিন পরে একমাত্রার মিল চোখেও আর বাধবে না, কান তার যথার্থ মূল্য দিতে শিখলে চোখ আপনিই মেনে নেবে। যা বলতে চাই ঠিক সেই কথাটি বলবো, সবচেয়ে স্বাভাবিক ও পরিচ্ছন্নভাবে বলবো, কবিদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এ-ই। তার জন্য যদি একমাত্রার মিল আনতে হয়, আনবো একমাত্রার মিল। যুগ্ম-মিল হ'লে ভালো, কিন্তু তার খাতিরে যদি বক্তব্যকে খর্ব কি কবিত্বকে ক্ষুণ্ণ করতে হয়, কি কোনো নীরস অসুন্দর কথা বসাতে হয়, তাহ'লে মোহগ্রস্ত হ'য়ে যুগ্ম-মিল আঁকড়ে প'ড়ে থাকবো না, কেননা ভালো কবিতা লেখাই আমাদের উদ্দেশ্য, ভালো মিল দেয়া নয়। এ-প্রসঙ্গে এটাও ভাববার যে সমস্ত 'কাব্যিক' শব্দ ও একই কথার বিভিন্ন আভিধানিক প্রতিশব্দ বর্জন ক'রে চলতে হ'লে আমাদের ব্যবহার্য শব্দসংখ্যা অনেকটা ক'মে যাবে, এবং সেই অনুপাতে অধিগম্য যুগ্ম-মিলের সংখ্যাও কমবে, তখন একমাত্রার মিলকে গ্রহণ না-করলে বোধ হয় চলবেই না। আমার মনে হয় আজকের দিনে 'হিয়া' 'দেখিবারে' কি

'হস্ব' দিয়ে মিল দেবার চাইতে একস্বরের মিল শতগুণে ভালো, এমন কি মিল না-দেয়াও ভালো।

'দময়ন্তী'তে একমাত্রার মিল আমি ব্যবহার করেছি। খুব বেশি না; কিন্তু সমালোচকের চোখে পড়বে। তাঁদের জানাতে চাই যে ঐ মিলগুলো ইচ্ছে ক'রেই দেয়া হয়েছে। এড়িয়ে যেতে না পারতুম এমন নয়, কিন্তু সে-জন্য যে-মারপ্যাঁচ করতে হ'তো তাতে কবিতাটি নষ্ট হ'তো। যা বলতে চাচ্ছি বলা হ'তো না। তাছাড়া কেউ কি সত্যি-সত্যি বলবেন যে

উচ্চকিত উচ্চস্বর ক্ষীণ হ'লো; দিন মরে ধুঁকে,
অন্ধকার শতছিদ্র একছন্দা তন্দ্রা-আনা ডাকে—

এখানে মিলের জন্য তাঁর উপভোগে কোনো ব্যাঘাত হয়েছে? মনে করুন যদি লিখতুম

উচ্চকিত উচ্চতান ক্ষীণ হ'লো; দিন মরে ঝুরে,
অন্ধকার শতছিদ্র একছন্দা তন্দ্রা-আনা সুরে—

তাহ'লে ডবল-মিলও হ'তো, বেশি 'কাব্যিক'ও হ'তো, কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে কোনটি ভালো তার বিচার পাঠকই করবেন।

কোনো থিওরি ক'রে কবিতা লেখা যায় না এ অতি পুরোনো কথা। যে-কোনো কবি যে-কোনো থিওরিই করুন নিজেই তা লঙ্ঘন করবেন, করতে বাধ্য। এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে যে-অনুশাসনগুলি লিপিবদ্ধ করেছি সে-সম্বন্ধেও এই কথা। অক্ষরে-অক্ষরে পালনের কথা ওঠে না, মোটামুটি একটা দিক্‌নির্ণয়ের আভাস হিসেবেই ওটা নিতে হবে। শুধু আমার একলার কথা নয়, বাংলা পদ্যের ও কবিতার নতুন একটা পরিণতির পথ এদিকে খোলা আছে ব'লে আমি বিশ্বাস করি। আমি নিজে 'কাব্যিক' শব্দের বিরোধী হ'য়েও হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে একটা কবিতায় লিখে ফেলেছিলুম:

প্রাণে মোর আনো তব বাণী, গানে মোর আনো তব সুর।

এ-কবিতা প'ড়ে অন্নদাশঙ্কর আমাকে লিখেছিলেন, 'শেষটায় আপনিও মোর লিখলেন!' না-লিখতে পারলেই খুশি হতুম বইকি। কিন্তু এখানে মোর আর তব বাদ দিতে গেলে কবিতার ছন্দ, সুর, ভাষাবিন্যাস সমস্তই বদলে ফেলতে হয়, তার মানে এ-কবিতাটি আর লেখাই হয় না, অন্য কবিতা লিখতে হয়। লেখা কবিতার চাইতে না-লেখা কবিতা যে ভালো নয় তার কোনো প্রমাণ নেই, কিন্তু কবিমাত্রেই জানেন যে কবিতার রূপকল্প একটা বাইরের জিনিস নয়, অন্তরের আবেগ থেকেই তার ছন্দ, সুর ও ভাষা গ'ড়ে ওঠে। তাই যে-কবিতা যে-ছন্দে মনের মধ্যে জন্ম নেয়, হয় সে-ছন্দেই লিখতে হয়,

নয় লেখাই হয় না। মোটামুটি কথাটাকে তাহ'লে এ-ভাবে বলা যাক যে 'কাব্যিক' ভাষা যতদূর সম্ভব এড়িয়েই চলতে হবে, কিন্তু যদি কখনো আন্তরিক ভাবাবেগের প্রেরণায় দু' একটা কথা অনিবার্যভাবে এসেই পড়ে, তাহ'লে সুদ্ধু সেইটে এড়াবার জন্য কবিতার স্বতঃস্ফূর্ত সহজ রূপটিকে নষ্ট না-ক'রে, কিংবা সমস্ত কবিতাটিই বর্জন না-ক'রে বরং সেটাকে সহ্য করাই ভালো। কবিতা সম্বন্ধে কোনো আঁটোসাঁটো ধরাবাঁধা আইনকানুন কোনোদিনই সম্ভব নয়, সবই মোটামুটির ব্যাপার। এবং এই প্রবন্ধের উপসংহারে এ-কথাও স্মরণ করি যে সব থিওরিই ক্ষণস্থায়ী, শেষ পর্যন্ত যা টেঁকে তা কবিতার প্রাণবস্তু, যা সকল থিওরিকে অতিক্রম ক'রে যায়।

'দময়ন্তীর' গ্রন্থনকার্যে অনেকেরই সহায়তা পেয়েছি, তাঁদের সকলকে নাম ক'রে ধন্যবাদ জানানো সম্ভব নয়। শুধু উল্লেখ করি যে তরুণ কবি মণীন্দ্র রায় প্রুফ দেখবার কাজে আমাকে সাহায্য করেছেন।

কলকাতা — বুদ্ধদেব বসু

এপ্রিল, ১৯৪৩